প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনো বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ-কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোনও শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। তার ওপর, প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক — অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপিকা (ড.) মণিমালা দাস

উপাচার্য

পরিচিতি

বিষয় ঃ শিক্ষা **স্নাতকোত্তর স্তর**

পাঠক্রম : পর্যায়

PG Education : 06 : 1 & 2

	রচনা	সম্পাদনা
একক 1–5	ড. সুবীর নাগ	অধ্যাপক পি. কে. চক্রবর্তী
একক 6–10	ড. মধুমালা সেনগুপ্ত	অধ্যাপক প্রণবকুমার চক্রবর্তী

ঘোষণা

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অধ্যাপক (ড:) বিকাশ ঘোষ
নিবন্ধক (কার্যনির্বাহী)

তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ : জুলাই, 2011

ভারত সরকারের দূর শিক্ষা পর্ষদের বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations and financial assistance
of the Distance Education Council, Government of India.

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

PG Education : 06

(স্নাতকোত্তর পাঠক্রম)

পর্যায় 1

একক 1	❑	শিক্ষা প্রশাসনের প্রকৃতি ও পরিধি	1 — 16
একক 2	❑	শিক্ষা প্রশাসনের তত্ত্ব	17 — 31
একক 3	❑	সংস্থার ধারণা	32 — 48
একক 4	❑	শিক্ষার আর্থিক প্রসঙ্গা	49 — 60
একক 5	❑	পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান	61 — 69

পর্যায় 2

একক 6	❑	শিক্ষা ব্যবস্থাপনা	70-80
একক 7	❑	শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্ব	81-95
একক 8	❑	শিক্ষামূলক পরিকল্পনা	96-107
একক 9	❑	নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া	108-118
একক 10	❑	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিকাশ	119-127

একক ১ ❑ শিক্ষা প্রশাসনের প্রকৃতি ও পরিধি
(Nature and Scope of Educational Administration)

গঠন (Structure)

১.১ প্রস্তাবনা

১.২ উদ্দেশ্য

১.৩ শিক্ষা প্রশাসনের প্রকৃতি ও পরিধি

১.৩.১ শিক্ষা প্রশাসন

১.৩.২ শিক্ষা প্রশাসনের মূল লক্ষ্য

১.৩.৩ শিক্ষা প্রশাসনের প্রকৃতি

১.৩.৪ শিক্ষা প্রশাসনের কার্যনীতি

১.৪ শিক্ষা প্রশাসনের সংস্থা

১.৫ কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার ও স্থানীয় স্বায়ত্ত সংস্থাগুলির ভূমিকা

১.৫.১ কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা

১.৫.২ রাজ্য সরকারের ভূমিকা

১.৫.৩ স্থানীয় স্বায়ত্ত সংস্থার ভূমিকা

১.৬ জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৮৬) ও রামমূর্তি কমিটির মতামত

১.৭ সারসংক্ষেপ

১.৮ প্রশ্নাবলি

১.১ প্রস্তাবনা (Introduction)

পৃথিবীর যে-কোনো দেশেই শিক্ষা একটি বিপুল কর্মযজ্ঞ হিসাবে স্বীকৃত। শিক্ষার নীতি নির্ধারণ, পাঠক্রম রচনা, পাঠক্রমের সফল প্রয়োগ, মূল্যায়ন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, অর্থনৈতিক সংস্থান

এইসব কিছুকে সঠিক ভাবে সচল রাখার প্রক্রিয়ার যে-কোনো একটি ব্যাহত হলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যগুলি শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। এই জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা, যা শিক্ষার লক্ষ্য পূরণের প্রধানতম হাতিয়ার। বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত। ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকশিক্ষিকা, অভিভাবক, পুস্তক রচয়িতা, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরে কর্মরত ব্যক্তিরা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কর্মীরা প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিক্ষাযন্ত্রকে সচল রাখার অন্যতম অংশীদার। শিক্ষাকে সচল রাখার অর্থ শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্ত উপাদানগুলির মধ্যে সংহতি ও সমন্বয় বজায় রেখে, তাৎক্ষণিক লক্ষ্য পূরণের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার অন্তিম লক্ষ্য পূরণের দিকে অগ্রসর হওয়া। এখানেই শিক্ষা প্রশাসনের গুরুত্ব সর্বাধিক।

১.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- শিক্ষা প্রশাসনের ধারণা দিতে পারবেন।
- শিক্ষা প্রশাসনের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষা প্রশাসনের কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার ও স্থানীয় স্বায়ত্ত সংস্থার ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।
- জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৮৬) ও রামমূর্তি কমিটির মতামত সম্বন্ধে মন্তব্য করতে পারবেন।

১.৩ শিক্ষা প্রশাসনের প্রকৃতি ও পরিধি (Nature and Scope of Educational Administration)

শিক্ষা প্রশাসনের প্রকৃতি সামগ্রিকভাবে উৎপাদনমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে কিছুটা ভিন্ন হলেও যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে। এখানে প্রথমে শিক্ষা প্রশাসন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা দিয়ে তারপর এর প্রকৃতি ও পরিধি সম্পর্কে আলোচনা করা হল। তবে যেহেতু শিক্ষা প্রশাসন একটি ফলিতবিদ্যা সেহেতু অন্যান্য তাত্ত্বিক বিষয়বস্তুর চেয়ে প্রশাসনিক লক্ষ্য ও কার্যনীতিগুলি উল্লেখ করা হল। এর প্রথমটি শিক্ষা

প্রশাসনের ধারণাকে স্পষ্ট করবে এবং দ্বিতীয়টি অর্থাৎ কার্যনীতিগুলি শিক্ষা প্রশাসনের পরিধি সম্বন্ধে ধারণা দান করবে।

১.৩.১ শিক্ষা প্রশাসন (Educational Administration)

শিক্ষা বলতে আমরা একজন শিক্ষার্থীর জীবনের পূর্ণবিকাশকে বুঝিয়ে থাকি, অর্থাৎ বৌদ্ধিক, মানসিক, প্রক্ষোভিক এবং দৈহিক বিকাশের পূর্ণতা অর্জন করাই শিক্ষার মূল লক্ষ্য। শিক্ষা প্রশাসন বলতে এমন একপ্রকার সাংগঠনিক ব্যবস্থাকে বোঝায় যার প্রয়োগের মাধ্যমে যে-কোনো শিক্ষাপদ্ধতি বা শিক্ষাতন্ত্র তার উদ্দেশ্যপূরণের দিকে মসৃণভাবে চলতে পারে। একেই কোনো শিক্ষা সংগঠনের মূল চালিকা শক্তি বলেও অভিহিত করা যায়। প্রকৃত সামাজিক উন্নতি-ই শিক্ষা প্রশাসনের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

১.৩.২ শিক্ষা প্রশাসনের মূল লক্ষ্য (Primary Aims of Educational Administration)

শিক্ষা প্রশাসনের ধারণা সঠিকভাবে পরিস্ফুট করতে হলে, এর লক্ষ্যগুলি সম্বন্ধে জানা দরকার। লক্ষ্যগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।

(১) প্রশাসন সম্বন্ধে নির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন করা ও তাকে যথাযথভাবে কার্যে রূপায়িত করার চেষ্টা করা।

(২) বিভিন্ন ধরনের সময়সীমা অনুসারে প্রকল্প নির্ধারণ এবং তার যথাযথ রূপায়ণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার বাধা দূর করার ক্ষেত্রে উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করা।

(৩) বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব বণ্টন এবং কর্তৃত্ব নির্ধারণ করে দেওয়া।

(৪) সংশ্লিষ্ট সমস্ত ব্যক্তির যে-কোনো উদ্ভাবনী প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দেওয়া।

(৫) কর্মীদের কর্মক্ষমতা ও প্রাপ্ত সম্পদের সদ্ব্যবহার করে উপযুক্ত লক্ষ্য পূরণে সচেষ্ট হওয়া।

(৬) প্রশাসনের সর্বস্তরের কর্মীদের এবং অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির সক্রিয় সহযোগিতা, আস্থা ও শুভেচ্ছা অর্জন করতে পারা এবং গণতান্ত্রিক ভাবধারার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা।

১.৩.৩ শিক্ষা প্রশাসনের প্রকৃতি (Nature of Educational Administration)

যে-কোনো সমাজের সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করে মানবসম্পদের সঠিক চিহ্নিতকরণ, যথাযথ বিকাশে সাহায্য করা, প্রকৃত মূল্যায়ন এবং সর্বোপরি এই সম্পদের সঠিক ব্যবহারের ওপর। শিক্ষা প্রশাসন প্রধানত এর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। শিক্ষা প্রশাসন হল শিক্ষা ব্যবস্থাপনার

একটি কার্যকরী দিক। কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা সংগঠনের মাধ্যমে শিক্ষার লক্ষ্যগুলি পূরণ করার পদ্ধতি হল শিক্ষা প্রশাসন। কোনো কোনো তাত্ত্বিক মনে করেন যে, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বা Educational Management যদি দেহ হয় তবে, শিক্ষা প্রশাসন বা Educational Administration হল তার মস্তিষ্ক স্বরূপ। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সঙ্গে শিক্ষা প্রশাসনের মূল পার্থক্য এই যে শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় সাধারণ বাণিজ্যিক লাভক্ষতির প্রশ্নটি গুরুত্ব পেয়ে থাকে। অথচ শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্রে সামাজিক উন্নতির ক্ষেত্রটি প্রধানত বিবেচিত হয়। শিক্ষাবিদ Siars শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যে তত্ত্বগুলি আলোচনা করেছেন তার সঙ্গে শিক্ষা প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। তাঁর বক্তব্য অনুসারে শিক্ষার মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করে নীতি প্রণয়ন করতে হয়। এই নীতি অনুসারেই কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়ে থাকে যার সঙ্গে অন্যান্য প্রত্যক্ষ বিষয়গুলির কথা বিবেচনা করতে হয়। যেমন—প্রয়োজনীয় অর্থ, উপযুক্ত মানবসম্পদ ও বিভিন্ন দ্রব্যাদির সুযোগসুবিধা। সঠিক মূল্যায়নের সাহায্যে শিক্ষা প্রশাসনের মূল উদ্দেশ্য কতটা সাধিত হচ্ছে তার পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনা শিক্ষা ব্যবস্থাপনার একটি মূল দায়িত্ব যা শিক্ষা প্রশাসনের মূল লক্ষ্য সাধনে সাহায্য করে থাকে।

F. W. Taylor যে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার (Scientific management) তত্ত্ব উল্লেখ করেছেন তাতে উপরিউক্ত নীতি বা পদ্ধতির বাইরেও তিনটি বিষয় বলা হয়েছে—

(i) যে-কোনো স্তরের কর্মের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে কর্মীর দক্ষতা অর্জনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(ii) কাজের সময় ও গতি পর্যালোচনার মাধ্যমে (work study and time study—ILO) যে-কোনো কাজের সঠিক মূল্যায়ন। International Labour Organisation-এর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে যে-কোনো কাজের প্রশাসনিক দক্ষতার বিষয়টি কাজের সময় ও গতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।

(iii) প্রশাসকের সঙ্গে অধস্তন কর্মচারীদের সুস্থ ও সহযোগিতার সম্পর্ক যে-কোনো প্রশাসন বা ব্যবস্থাপনাকে সাফল্যমণ্ডিত করে।

Henry Fayol যে, Operational Management Theory বা, কর্মসম্পাদনমূলক ব্যবস্থাপনার মতবাদ উল্লেখ করেছেন তাতে শিক্ষা প্রশাসনের সাফল্যের জন্য কর্মীদের পেশাদারি দক্ষতার বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে।

Max Weber তাঁর Bureaucratic Theory of Management বা আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার মতবাদে পেশাদারি দক্ষতা ছাড়াও শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, নিরপেক্ষতা প্রভৃতি গুণাবলির উল্লেখ করেছেন যা যে-কোনো প্রশাসনের সাফল্যলাভের মূল কথা।

মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে Neo Classical Approach বা নয়া ক্ল্যাসিকাল মতবাদ যে-কোনো প্রশাসনের কর্মীদের দক্ষতার পাশাপাশি উপযুক্ত মানসিকতা গঠনকে গুরুত্ব দিয়েছে। যার মূল কথাই হল কর্মীদের মধ্যে উপযুক্ত প্রেষণা (motivation) গড়ে তোলা, যা না থাকলে কোনো ক্ষেত্রেই উৎপাদনী দক্ষতা বৃদ্ধি পেতে পারে না।

Knezvich এবং Nort শিক্ষা প্রশাসন সম্বন্ধে যে মূল বিষয়গুলি উল্লেখ করেছেন তা হল—

- নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ, পূরণ ও মূল্যায়ন।
- ওই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সকল প্রকার পদ্ধতি ও প্রচেষ্টাকে ফলপ্রসূ করার চেষ্টা করা।
- মানবসম্পদ ও বস্তু সম্পদের যথাযথ সদ্ব্যবহার, সর্ববিধ প্রচেষ্টাকে সুসংগঠিত করা এবং সব ধরনের প্রচেষ্টাগুলির মানোন্নয়ন করা।
- উদ্দেশ্য, সংগঠন, নেতৃত্বদান, কর্তৃত্ব এবং দলগত প্রচেষ্টার উপযুক্ত ভারসাম্য বজায় রাখা।
- পরিকল্পনা, সংযোগ, সমন্বয়, সমস্যার সমাধান এবং মূল্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির যথার্থ সমন্বয়সাধন।

সুতরাং শিক্ষা প্রশাসন একটি ধারাবহিক, গতিশীল, সমন্বয়কারী পরিকল্পিত সাংগঠনিক প্রক্রিয়া যা সম্পদের যথাযথ সদ্ব্যবহার করে। শিক্ষার লক্ষ্য পূরণে তথা সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করে।

১.৩.৪ শিক্ষা প্রশাসনের কার্যনীতি (Principles of Educational Administration)

এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে শিক্ষা প্রশাসনের পরিধি সবচেয়ে ভালো বোঝা যায় এর কার্যনীতিগুলির মাধ্যমে। কারণ প্রকৃত অর্থে শিক্ষা প্রশাসনের পরিধি যতটা বিস্তৃত ততটাই পরিবর্তনশীল। জাতীয়নীতি, সমাজের চাহিদা, অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা প্রশাসনের পরিধিও কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে যায়।

- শিক্ষা প্রশাসন বিশেষ প্রয়োজন ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে। কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি অনুসারে রাজ্য সরকার তাদের শিক্ষাপ্রকল্প রূপায়ণ করে থাকেন। যার মূল দায়িত্ব পালন করে শিক্ষা প্রশাসন।

- কেন্দ্র, রাজ্য বা স্থানীয় স্বায়ত্ত সংস্থার যে-কোনো পরিকল্পনা বা প্রকল্প রূপায়ণের জন্য আর্থিক অনুদান, মানবসম্পদ ও বস্তুসম্পদের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা শিক্ষা প্রশাসনের মূল দায়িত্ব।
- শিক্ষানীতি অনুসারে নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ শিক্ষা প্রশাসনের মূল দায়িত্ব—এর জন্য তিনপ্রকার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়ে থাকে—

  (১) দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা—পাঁচ বৎসর বা তার বেশি।

  (২) মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা—দুই বা তিন বৎসর কিন্তু পাঁচ বৎসরের কম।

  (৩) স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা—এক থেকে দুই বৎসর পর্যন্ত।
- শিক্ষা প্রশাসনের কার্যনীতি অনুসারে উপযুক্ত কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ। কর্মধারাগুলির স্তরবিন্যাস করা শিক্ষা প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য।
- কাজের ধরন অনুসারে উপযুক্ত দক্ষ কর্মী নির্বাচন এবং তাদের যথাযথ উৎসাহ প্রদান করা প্রশাসনিক দায়িত্বের একটি উল্লেখযোগ্য দিক।
- কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ বাধা উপনীত হলে তার প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা করা শিক্ষা প্রশাসনের অন্য আর একটি বিশেষ দায়িত্ব।
- কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে মূল উদ্দেশ্য বা নীতি কতখানি রূপায়িত হয়েছে তার নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা এবং নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সম্ভাব্য ত্রুটি বা বাধাগুলি দূর করা শিক্ষা প্রশাসনের মূল কার্যনীতির সঙ্গো অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

১.৪ শিক্ষা প্রশাসনের সংস্থা (Agencies of Educational Administration)

শিক্ষা প্রশানের মূল লক্ষ্যই হল এমন একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থার সংগঠন যেখানে মানবসম্পদ ও বস্তুসম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার করে এমন একটি কর্মপদ্ধতি গড়ে তোলা, যার দ্বারা শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি সুষ্ঠুভাবে এবং সঠিকভাবে রূপায়িত হতে পারে। যে-কোনো ধরনের শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করার জন্য উপযুক্তভাবে পরিকল্পনা করা, নীতি নির্ধারণ করা, কর্মপদ্ধতি ঠিক করা এবং সর্বোপরি সামগ্রিকভাবে নির্ধারিত কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে কতটা উদ্দেশ্য সফল হল তা সঠিক মূল্যায়ন করার জন্য শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন স্তর অনুসারে নানা সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা (Agency) বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

স্বাধীনতার আগে ব্রিটিশ সরকার দ্বৈত শাসনব্যবস্থা (diarchy) প্রচলিত করেছিল। তারা শিক্ষাকে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে রাখেনি। তারা আঞ্চলিক স্বশাসিত সংস্থার হাতে শিক্ষা প্রসারের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিল। যদিও নিয়ন্ত্রণের মূল চাবিকাঠি ছিল গভর্নর জেনারেলের হাতে। আঞ্চলিক সংস্থাগুলি মূলত প্রাথমিক শিক্ষা সংগঠনের দায়িত্ব পালন করত।

স্বাধীনতার পরে শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্রে ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা অপেক্ষাকৃত ইতিবাচক হয়। সংবিধানের সপ্তম তপশিলের দ্বিতীয় তালিকার ১১নং ধারা অনুসারে শিক্ষাকে রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রথম তালিকার ৬৩নং ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে রাখা হয় জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে যেমন—বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ৬৪ নং ধারা অনুসারে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার গবেষণাকেন্দ্রগুলিকে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হয়। তৃতীয় তালিকার ২৫নং ধারায় বৃত্তিমূলক ও পেশাগত শিক্ষা, ৪৫নং ধারায় প্রাথমিক শিক্ষা, ২০নং ধারায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা যৌথ তালিকাভুক্ত হয়। ২৮২নং ধারা অনুসারে রাজ্যগুলিকে শিক্ষার উন্নয়নখাতে কেন্দ্রীয় ব্যয়বরাদ্দ থেকে অনুদান মঞ্জুর করার বিষয়টি (Grant-in -aid) উল্লেখ করা হয়।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ভূমিকা ছাড়াও এই বিশাল দেশের শিক্ষা প্রসারে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, ট্রাস্ট্রি বোর্ড, ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার (Non-Governmental Organisation) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাদপ্তরের নাম বদল হয়ে হয়েছে 'মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক'। যার শীর্ষে আছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও তাঁর সেক্রেটারিয়েট। শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন উপদেষ্টা কমিটি এই মন্ত্রকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। যেমন, University Grants Commission (UGC), National Knowledge Commission, All India Council of Technical Education (AICTE), Medical Council of India (MCI), National Council of Teacher Education (NCTE), National Council of Educational Research and Training (NCERT), Central Advisory Board of Education (CABE), National Institute of Educational Planning and Administration (NIEPA), Rehabilitation Council of India (RCI) ইত্যাদি।

প্রত্যেকটি স্তরের বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরগুলি একটি সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করে থাকে। আমাদের দেশে শিক্ষা প্রশাসনের সাফল্যের জন্য সবচেয়ে বড়ো বাধা হল এই বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্যে

প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান। স্বাধীনতার পর থেকে ১৫ বছরের কম বয়সি শিশুদের জন্য বিদ্যালয় শিক্ষা আবশ্যিক করার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর তাকে আবার নতুন নাম দিয়ে 'সর্বশিক্ষা শিক্ষা অভিযান' রূপে চালু করা হয়েছে। সারা দেশ জুড়ে বিভিন্ন জেলাকে কাগজে কলমে পূর্ণ স্বাক্ষর বলে চিহ্নিত করলেও বাস্তবক্ষেত্রে তা সর্বদা গ্রহণযোগ্য হয়নি।

শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরগুলির যথাযথ দায়িত্ব ও কর্তব্য কতটুকু সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হল—

১.৫ কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার ও স্থানীয় স্বায়ত্ত সংস্থাগুলির ভূমিকা (Role of Central, State Governments and Local Bodies)

১.৫.১ কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা (Role of Central Government)

সাংবিধানিক কাঠামো অনুসারে শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রক বলে কেন্দ্রীয় সরকারের এই বিভাগটি শিক্ষাক্ষেত্রের বিভিন্ন উন্নয়ন, বিকাশ, আইন প্রণয়ন ইত্যাদি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে থাকে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় পরামর্শদাতার নাম যারা এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞের ভূমিকা পালন করেন। এক নজরে কেন্দ্রীয় সরকারি ভূমিকাগুলি নিম্নরূপ—

● **পরিকল্পনা (Planning) ঃ** রাজ্য বা স্থানীয় স্তরের চাহিদা অনুসারে জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসরণ করে বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ।

● **সংগঠন (Organisation) ঃ** শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য নির্দিষ্ট সাংগঠনিক উদ্যোগ গ্রহণ। যেমন, সর্বশিক্ষা অভিযান, পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ শিক্ষা প্রকল্পের উদ্যোগ ইত্যাদি।

● **নির্দেশনা (Guidance) ঃ** যে-কোনো নীতির যথাযথ রূপায়ণ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও পরামর্শ দেওয়া।

● **নিয়ন্ত্রণ (Control) ঃ** যেহেতু কেন্দ্রীয় অনুদান বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাই ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এমনকি রাজ্য সরকারগুলি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে এবং সময়সীমা

অনুসারে দায়বদ্ধতা পূরণের জন্য আর্থিক ব্যয় ও পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য তারা কেন্দ্রীয় সংস্থাকে দিয়ে থাকে।

● **শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন সুযোগসুবিধার সমবন্টন (Even distribution of facilities) ঃ** কেন্দ্রীয় নীতি অনুসারে সারা দেশের কোনো জনসম্প্রদায় যাতে অবহেলিত না হয় এবং সকলেই যাতে সমান সুযোগসুবিধা লাভ করে তা নিশ্চিত করা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তব্য।

● **কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল** বা **রাষ্ট্রপতি শাসনাধীন** রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করা।

● **বিভিন্ন প্রকল্পের অনুমোদন** যা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, উচ্চতর গবেষণা এমনকি সর্বসাধারণের গণসচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়ে সহায়তা করতে পারে।

১.৫.২ রাজ্য সরকারের ভূমিকা (Role of State Government)

রাজ্য সরকার মূলত কেন্দ্রীয় সরকারি নীতির প্রয়োগ এবং তার যথাযথ উদ্দেশ্য পূরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। কোনো কোনো রাজ্যে শিক্ষাদপ্তর একটি মন্ত্রকের অধীনে হলেও পশ্চিমবঙ্গো শিক্ষা দপ্তরের বেশ কয়েকটি সুনির্দিষ্ট বিভাগ আছে। যেমন—প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রক, উচ্চশিক্ষা মন্ত্রক, জনশিক্ষা মন্ত্রক ও মাদ্রাসা শিক্ষা মন্ত্রক ইত্যাদি। এটি শিক্ষার বিকেন্দ্রীকরণের একটি অত্যন্ত কার্যকরী এবং আধুনিক মডেল যার ফলে শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমান নজর দেওয়া সম্ভব হয়। এক নজরে রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিম্নরূপ—

● **আইন প্রণয়ন (Legislation) ঃ** বর্তমানে শিক্ষা সংবিধানের যৌথ তালিকার অন্তর্ভুক্ত। সেজন্য কেন্দ্রীয় নীতি ও প্রকল্প ছাড়াও রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন শিক্ষার বেশ কিছু ক্ষেত্র যেমন, প্রাথমিক শিক্ষা, নারী শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাজ্য বিধানসভায় আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাজ্য সরকারের আছে। তবে নিয়ম অনুযায়ী কোনো আইন প্রণয়ন করা হলেও তাকে কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদন প্রয়োজন।

● **আর্থিক অনুদান (Financial Grant) ঃ** প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার সবটাই এবং উচ্চশিক্ষার বেশ কিছু আর্থিক দায়ভার মূলত রাজ্য সরকারের ওপর বর্তায়। রাজ্য বাজেটের আর্থিক অনুদানের একটি বড়ো অংশই ব্যয় হয় শিক্ষার সঙ্গো যুক্ত বিভিন্নস্তরের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের বেতন, ভাতা, পেনশন ইত্যাদি বাবদ।

● **রাজ্যের চাহিদা অনুসারে পাঠক্রম তৈরি (Curriculum Development as per State level needs)** ঃ ভারতের মতো বিশাল দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক চাহিদা একই রকম না হওয়াই স্বাভাবিক। তাই প্রত্যেক রাজ্যই তাদের নিজস্ব ভাষা, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ইত্যাদি অনুসারে বিদ্যালয় স্তরে পাঠক্রম রচনা করে থাকে। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় একেবারে স্থানীয় স্তরের চাহিদা অনুসারেও কোনো বিশেষ শিক্ষা প্রকল্প নেওয়া হয়।

● **তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন (Supervision and Inspection)** ঃ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় নজরদারি করা রাজ্য সরকারের দায়িত্ব।

● **শিক্ষাকর্মী ও শিক্ষকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা (Employment of Teaching and Non-teaching staff)** ঃ রাজ্যের বিভিন্ন উপদেষ্টা পর্ষদ যেমন—State Council of Educational Research and Training (SCERT), Council of Higher Education, State Council of Higher Education ইত্যাদি রাজ্য সরকারকে শিক্ষার প্রসার ও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য ও পরামর্শ দিয়ে থাকে। এ ছাড়াও আছে নানা স্তরের শিক্ষা পর্ষৎগুলি। যেমন, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষৎ (Board of Primary Education), মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ (Board of Secondary Education), উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ (Council of Higher Secondary Education), সংখ্যালঘুদের জন্য বোর্ড, প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ শিক্ষা সংক্রান্ত বোর্ড বা কমিটি ইত্যাদি। উচ্চশিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রধানত স্বশাসিত কিন্তু সরকারি অনুদান নির্ভর বিশ্ববিদ্যালয় বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

১.৫.৩ স্থানীয় স্বায়ত্ত সংস্থার ভূমিকা (Role of Local Bodies)

ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো অনুসারে শিক্ষার মূল নীতি, পরিকল্পনা এবং আর্থিক দায়দায়িত্ব ও আইন প্রণয়ণের ক্ষমতা মূলত কেন্দ্রীয় সরকার এবং তার অধীনে রাজ্য সরকারের হাতে থাকলেও সেই নীতির উপযুক্ত প্রয়োগ করার দায়িত্ব স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতেই থাকে এবং কোন্ প্রকল্প কতটা বাস্তবায়িত হল সে বিষয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষদের রাজ্য সরকারের কাছে দায়বন্ধ থাকতে হয়। ভারতের মতো বিশাল দেশে এইসব স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বলতে বিভিন্ন ধরনের সংস্থাকে বোঝায়, যাদের সাধারণত মূল দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—

(১) সরকারি সাহায্য বা অনুদান প্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যেমন, কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটি, গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক আধিকারিক, স্থানীয় উদ্যোগে গঠিত ট্রাস্ট বা বিশেষ ধর্মীয় বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

(২) **বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান** যারা মূলত ব্যক্তি মালিকানাধীন এবং সরকারি কোনো অনুদান গ্রহণ না করেই সরাসরি উপভোক্তাদের অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে উচ্চ হারে বেতন নিয়ে তাদের পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করে। কিছু কিছু N.G.O., দাতব্য প্রতিষ্ঠান, জনকল্যাণমূলক ট্রাস্ট বা মিশন, সরকারি অনুদান ছাড়াই জনসাধারণের সাহায্যের বা দানের অর্থে কোনো ব্যাবসায়িক লাভ ছাড়াই তাদের প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে।

সাধারণভাবে এদের ভূমিকা নিম্নরূপ—

● রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থাগুলি তাদের প্রকল্প রূপায়ণে রাজ্য সরকারি নীতির উদ্দেশ্য পালনে সহায়তা করে।

● পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, দৈনন্দিন হাজিরা ও পঠনপাঠন প্রক্রিয়া জারি রাখা এবং প্রয়োজনীয় তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

● স্থানীয় চাহিদা অনুসারে উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি, নানা উন্নয়নমূলক কাজের পরিকল্পনা করা, গণসচেতনতা বৃদ্ধি, জনস্বাক্ষরতা প্রকল্প, মিড ডে মিল ব্যবস্থাকে চালু রাখা, আর্থিক দুস্থ ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ সহায়তা দান স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য।

১.৬ জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৮৬) এবং রামমূর্তি কমিটির মতামত [Views of NPE (1986) and Rammurthy Committee on Educational Administration]

1986 সালে আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি প্রবর্তিত হয়। 1990 সালের 7 নভেম্বর আচার্য রামমূর্তির সভাপতিত্বে 16 জন সদস্যের এক কমিটি 1986 সালের জাতীয় শিক্ষানীতি পর্যালোচনা করার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং এই কমিটির রিপোর্টের মূল শিরোনামটি ছিল নিম্নরূপ—

"Towards on Enlightened and Humane Society". এই কমিটি শিক্ষা প্রশাসন এবং শিক্ষক শিক্ষণ কয়েকটি প্রধান বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে অনেকগুলি সুপারিশ করেন।

● সংবিধানের ৪২ তম সংশোধন অনুসারে (1976) শিক্ষা যুগ্ম তালিকাভুক্ত হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং যৌথ দায়িত্বের ক্ষেত্রগুলি সুনির্দিষ্টভাবে শনাক্ত করা হয়েছে।

● কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রক যার বর্তমান নাম মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রক মূলত নিম্নলিখিত দায়িত্বগুলি পালন করে থাকে—

(১) কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি নির্ধারণ করে এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ও সময়সীমা অনুসারে পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরি করে।

(২) শিক্ষা সংক্রান্ত নির্দিষ্ট নীতিগুলিকে আরও উন্নত করার চেষ্টা করে এবং বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ও কমিটি গঠনের মাধ্যমে তাদের সুপারিশগুলি কার্যকর করে। বিভিন্ন শিক্ষা সংগঠনগুলির সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন ও তদারকির কাজ করে।

(৩) রাজ্য সরকারের বিভিন্ন শিক্ষাবিভাগ ও শিক্ষা সংগঠনগুলিকে সঠিক নির্দেশ দেওয়া ও তাদের উৎসাহিত করা তথা বিভিন্ন সমস্যা নিরসনে সাহায্য করা কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদের অন্যতম প্রধান কাজ।

(৪) রাজ্য সরকারের সীমিত আর্থিক ক্ষমতা বহু শিক্ষার উন্নয়মূলক প্রকল্প সঠিকভাবে রূপায়ণের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দেখা দেয়। তাই আর্থিক অনুদান কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রশাসনের একটি অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

(৫) শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা বৈষম্য দূর করে বিভিন্ন সুযোগসুবিধা দেওয়ার জন্য উপযুক্ত প্রকল্প গৃহীত হয় যাতে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী যেমন, তপশিলি জাতি, উপজাতি ইত্যাদি এবং শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী ও নারীদের ক্ষেত্রে শিক্ষার বিশেষ সুযোগ সৃষ্টিকারী প্রকল্প চালু করা যায়। যেমন, সর্বশিক্ষা অভিযান বা Education for all. বর্তমান শিক্ষা জগতের একটি নতুন উদ্যোগ।

(৬) বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ, বিতরণ, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, নিরন্তর গবেষণা ইত্যাদি বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষার উন্নয়ন সংক্রান্ত পরিস্থিতি সম্বন্ধে সকলকে অবহিত করে।

(৭) কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল যেমন, দিল্লি, চণ্ডীগড়, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদির শিক্ষা প্রশাসন সরাসরিভাবে কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তর দ্বারা পরিচালিত হয়।

(৮) বিভিন্ন কেন্দ্রীয় শিক্ষা সংগঠনসমূহ যেমন, U.G.C., NCERT, NCTE, AICTE, MCI ইত্যাদি সংস্থা সারাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রের বিভিন্নস্তরের একপ্রকার সামঞ্জস্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

সুপারিশগুলি হল—

● রাজ্যস্তরের মোটামুটি বিদ্যালয় শিক্ষা (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর), জনশিক্ষা তথা স্বাক্ষরতা প্রকল্প, উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে পরিকাঠামোগত ও সাংগঠনিক, প্রশাসনিক দায়িত্ব নিতে বলা হয়েছে।

● উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয়ভার কমিয়ে আনার সুপারিশ এবং কিছু কিছু বেসরকারি উদ্যোগ ও স্বশাসনকে স্বাগত জানানোর কথা বলা হয়েছে।

● শিক্ষার বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralisation in Education) 1986-এ প্রবর্তিত জাতীয় শিক্ষানীতি বা NPE '86-এর Programme of Action (POA)-এ উল্লিখিত একটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ যার অন্যতম একটি দিক হল গ্রাম শিক্ষা কমিটি (Village Education Committee) গঠন করা, যাদের হাতে এক বা একাধিক গ্রামের শিক্ষার উন্নয়নের ভার থাকবে।

● দেশের সকল শিশুর জন্য অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার পাশাপাশি বয়স্ক শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক পাঠক্রমের ওপর বিশেষ নজর দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।

● মুক্ত শিক্ষা বা open বা distance mode of education-কে উৎসাহ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, যেখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হয়েছে যে, ".......this open learning should bring higher education to every doorstep".

● শিক্ষার প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ক্ষেত্রে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট সুপারিশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন—

(১) B. Ed. (Bachelor of Education) এবং P.T.T. (Primary Teacher Training) কেবলমাত্র এককালীন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি হিসাবে প্রচলিত ব্যবস্থায় চললেও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একটি নিরবিচ্ছিন্ন স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ায় অন্তর্গত করা উচিত যাতে তারা শিক্ষা প্রক্রিয়ার আধুনিক তত্ত্ব ও পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারে।

(২) এই নিরবিচ্ছিন্ন শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। যেমন—প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির কিছু কিছুকে জেলা অনুযায়ী DIET (District Institute of Education and Training)-এ উন্নীত করা, কিছু B. Ed. কলেজকে C.T.E.-তে (College of Teacher Education) রূপান্তরিত করা এবং কিছু শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে I.A.S.E.-তে (Institute of Advanced Studies in Education) উন্নীত করা। এইসব নিরবিচ্ছিন্ন শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অন্তর্গত।

(৩) B. Ed. পাঠক্রমের ক্ষেত্রে দক্ষতাভিত্তিক এবং নিষ্ঠামুখী (Competency based and Commitment oriented) যা দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করবে তার প্রচলন সুপারিশ করা হয়েছে যাতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মান উন্নয়ন ঘটে।

(৪) সামাজিক দায়বদ্ধতার দিকটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে যার একটি অন্যতম প্রধান প্রয়োগের ক্ষেত্র হল—Community Outreach Activities.

(৫) শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশ পরিকল্পনা (Internship Programme) এবং নেতৃত্বগুণের বিকাশের (Development of leadership quality) কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে শিক্ষক প্রশিক্ষণের গুণগত মান উন্নয়ন করা সম্ভব।

১.৭ সারসংক্ষেপ (Summary)

শিক্ষা প্রশাসন এমন একটি প্রক্রিয়া যা সমন্বয়, সংগঠন, পরিকল্পনা ও উপযুক্ত নেতৃত্বের মাধ্যমে শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন ও সামাজিক উন্নয়নে সাহায্য করে, শিক্ষাপ্রশাসন শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি। শিক্ষা প্রশাসনের মূল লক্ষ্য, সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন, কর্মীদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন, উদ্ভাবনী প্রচেষ্টায় উৎসাহদান, মানবসম্পদ ও বস্ত্র সম্পদের সদ্‌ব্যবহার এবং সকলের আস্থা অর্জন করে লক্ষ্যের পথে অগ্রসর হওয়া।

শিক্ষা প্রশাসনের কার্যনীতি তথা পিরিধির অন্তর্গত হল পরিকল্পনা গ্রহণ। স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি এই তিনপ্রকার পরিকল্পনা প্রয়োজন মতো গ্রহণ করা হয়। পরিকল্পনার মেয়াদ যাই হোক না কেন, উপযুক্ত কর্মী নির্বাচন ও নিয়োগ, পরিকল্পনা রূপায়ণের পথে কোনো বাধা উপস্থিত হলে তার অপসারণ বা সমস্যার সমাধান এইসব শিক্ষা প্রশাসনের কর্মপরিধির অন্তর্গত। এ ছাড়াও, প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা, তাদের উৎসাহ ও প্রেষণা বৃদ্ধি করা এবং সন্তুষ্টিবিধান এই সবই শিক্ষা প্রশাসনের অন্যতম কর্মপরিধি।

যেসব প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন শিক্ষার প্রশাসনকে নানাভাবে সফল ও সক্রিয় রাখে তাকে বলে শিক্ষা প্রশাসনের সংস্থা। শিক্ষা প্রশাসনের সংস্থা হিসাবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার ছাড়াও আছে নানা প্রকার স্থানীয় স্বায়ত্তসংস্থা। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে যে দ্বৈত শাসনব্যবস্থা ছিল তাতে শিক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল রাজ্য বা আঞ্চলিক সংস্থার হাতে। স্বাধীনতার পর প্রথম শিক্ষাকে সংবিধানের রাজ্য তালিকায় রাখা হয় এরপর 1976-এ শিক্ষাকে আনা হয় যুগ্মতালিকায়। কেন্দ্রীয় সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক শিক্ষার নীতি প্রণয়ন, রাজ্যগুলিকে অনুদান বন্টন, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা সংস্থা, মুক্ত বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়, UGC, NCERT, NCTE, AICTE, NIEPA ইত্যাদি উপদেষ্টা সংস্থাগুলি পরিচালনা করা ইত্যাদি কাজ করে থাকে। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের ভূমিকা অনেকটা সমান্তরাল। উভয়েই আইন প্রণয়ন, পরিকল্পনা গঠন, সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কাজ

সম্পন্ন করে। স্থানীয় স্বায়ত্ত সংস্থাগুলির কাজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারি পরিকল্পনার রূপায়ণ।

জাতীয় শিক্ষানীতিকে (1986) পর্যালোচনা করার জন্য 1992-এ রামমূর্তি কমিটি গঠিত হয়। কমিটি ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বর্তমান ভূমিকাকে। তাদের সুপারিশে ব্যয়ভার কমানোর বিকেন্দ্রীকরণ, বেসরকারিকরণ, নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলি স্থান পায়।

১.৮ প্রশ্নাবলি (Questions)

১। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) Talyor-এর বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার তত্ত্ব কী?

(খ) আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা কাকে বলে?

(গ) মেয়াদ অনুযায়ী কয়প্রকার পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে?

(ঘ) শিক্ষা প্রসাসনের সংস্থা বলতে কী বোঝায়?

(ঙ) SCERT-র কাজ কী?

(চ) জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী যে-কোনো দুটি প্রশাসনিক নীতির কথা উল্লেখ করুন।

২। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) শিক্ষা প্রশাসনের মূল লক্ষ্যগুলি কী কী?

(খ) শিক্ষা প্রশাসনে কেন্দ্রীয় সংস্থার ভূমিকা কী?

(গ) শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার ভূমিকা কতটা সমর্থনযোগ্য?

(ঘ) শিক্ষক শিক্ষণ সম্বন্ধে রামমূর্তি কমিটির মতামত সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।

(ঙ) শিক্ষা প্রশাসনে রাজ্য সরকারের ভূমিকা কী?

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) শিক্ষা প্রশাসন কাকে বলে? শিক্ষা প্রশাসনের প্রকৃতি ও পরিধি আলোচনা করুন।

(খ) শিক্ষা প্রশাসনের মূল লক্ষ্যগুলি উদাহরণসহ আলোচনা করুন। এই প্রসঙ্গে শিক্ষা প্রশাসনের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করুন।

(গ) প্রশাসনিক সংস্থা কাকে বলে? প্রশাসনিক সংস্থা হিসাবে সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির তুলনামূলক আলোচনা করুন।

(ঘ) শিক্ষা প্রশাসন সম্বন্ধে জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৮৬) এবং রামমূর্তি কমিটির সুপারিশগুলি উল্লেখ করুন। এইসব সুপারিশ কতটা কার্যকর করা হয়েছে?

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

একক ২ ❑ শিক্ষা প্রশাসনের তত্ত্ব
(Theories of Educational Administration)

গঠন (Structure)

২.১ প্রস্তাবনা

২.২ উদ্দেশ্য

২.৩ শিক্ষা প্রশাসনের তত্ত্ব

২.৩.১ শিক্ষা প্রশাসন ও নেতৃত্ব

২.৩.২ শিক্ষা প্রশাসন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

২.৪ শিক্ষা প্রশাসনের মূল তত্ত্বসমূহ

২.৪.১ ক্ল্যাসিকাল তত্ত্ব

—বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার তত্ত্ব

—প্রশাসনিক নীতি

—আমলাতান্ত্রিক সংগঠন তত্ত্ব

২.৪.২ নয়া ক্ল্যাসিকাল তত্ত্ব

২.৪.৩ আধুনিক ব্যবস্থাপনার তত্ত্ব

—তন্ত্র অভিমুখ তত্ত্ব

—আকস্মিকতা অভিমুখ তত্ত্ব

২.৫ সারসংক্ষেপ

২.৬ প্রশ্নাবলি

২.১ প্রস্তাবনা (Introduction)

শিক্ষা প্রশাসনের প্রকৃতি, পরিধি ও লক্ষ্য পাঠ করে বোঝা যায় পরিকল্পিত প্রশাসনের গুরুত্ব কতখানি। স্বাভাবিকভাবেই প্রশাসনের নীতি নির্ধারণের জন্য প্রশাসনের তাত্ত্বিক ভিত্তি নিয়ে বিশেষজ্ঞ প্রশাসকরা অনেক গবেষণা করেছেন। শুধু তাই নয় প্রশাসনের নীতি সমস্ত প্রতিষ্ঠানে বা সবসময় এক

থাকে নি। এর ফলে অনেক প্রশাসনিক তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে। এইসব তত্ত্বের কোনোটিই সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয় আবার কোনোটিই সম্পূর্ণ ভুল নয়। বরং বলা ভালো, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা প্রশাসনের নীতিতে বিশেষ বিশেষ তত্ত্বের প্রাধান্য থাকলেও অন্য ধরনের তত্ত্বের কিছু কিছু প্রতিফলন তাতে থেকে যায়। এই একটিতে সংক্ষেপে প্রধান প্রধান প্রশাসনিক তত্ত্বগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। তত্ত্বগুলি পাঠ করলে বোঝা যাবে সাধারণভাবে শিক্ষা বা বাণিজ্যিক ও সরকারি প্রশাসনের ভিত্তিতে তত্ত্বগুলির সৃষ্টি হলেও তার অধিকাংশই শিক্ষার প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য।

২.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই কয়েকটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- শিক্ষা প্রশাসনের নেতৃত্বের প্রকারভেদ সম্বন্ধে বলতে পারবেন।
- শিক্ষা প্রশাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষা প্রশাসনের মূল তত্ত্বগুলির নাম বলতে পারবেন।
- ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বগুলির প্রকৃতি ও প্রকারভেদ উল্লেখ করতে পারবেন।
- নয়া ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আধুনিক ব্যবস্থাপনার তত্ত্বগুলি জানতে পারবেন।
- তন্ত্র অভিমুখ তত্ত্ব ও আকস্মিকতা অভিমুখ তত্ত্ব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে পারবেন।

২.৩ শিক্ষা প্রশাসনের তত্ত্ব (Theories of Educational Administration)

শিক্ষা প্রশাসনের নীতি ও লক্ষ্য সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এর আগের এককে সংক্ষেপে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব উল্লেখ করা হয়েছে যার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এই এককে দেওয়া হল। যে-কোনো শিক্ষা প্রশাসনের মূল কথাই হল নেতৃত্বদান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নেতৃত্ব বলতে বোঝায় একধরনের নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে নেতার সংগঠিত প্রচেষ্টা যার মাধ্যমে অন্য কর্মীরা উৎসাহিত হতে পারে। দক্ষতার মান উন্নত হতে পারে, প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াটি (Management) আরও সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত হতে পারে। এই নেতৃত্ব প্রদানের ধরন অনুসারে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন সময় নানা তত্ত্বের উপস্থাপনা করেছেন।

২.৩.১ শিক্ষা প্রশাসন ও নেতৃত্ব (Educational Administration and Leadership)

নির্দিষ্ট তত্ত্বগুলি আলোচনার আগে সাধারণভাবে নেতৃত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আলোচনা করা দরকার। কিছু প্রশাসকের মধ্যে সহজাতভাবে নেতৃত্বের গুণগুলি প্রকাশ পায়, কিছুক্ষেত্রে নেতৃত্বদান বিষয়টি হয়ে ওঠে প্রথাগত—অর্থাৎ, যিনি নেতা তিনি প্রশাসনকে কিছু নির্দিষ্ট নিয়মাবলি ইত্যাদি দ্বারাই চালিত করে থাকেন। আবার কখনও দেখা যায় নেতৃত্বের গুণে প্রশাসনিক কার্যকারিতা নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণে সুষ্ঠুভাবে সাহায্য করে। প্রশাসনের শীর্ষে যিনি থাকেন তিনিই নেতা এবং প্রকৃতি অনুসারে এই নেতৃত্বপ্রদান বিভিন্ন ধরনের হতে পারে—

- স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব ঃ (Hypocratic leadership)
- গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব ঃ (Democratic leadership)
- আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্ব ঃ (Bureaucratic leadership)
- একনায়কতন্ত্রী নেতৃত্ব ঃ (Dictatorial leadership)
- অবাধ নেতৃত্ব ঃ (Laissez-faire leadership)
- কর্মসম্পাদনী নেতৃত্ব ঃ (Transactional leadership)

২.৩.২ শিক্ষা প্রশাসন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Educational Making)

নেতৃত্বের একটি বিশেষ গুণ হল সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। Mcfarland সিদ্ধান্ত গ্রহণকে নিম্নলিখিত চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন—

(ক) সাংগঠনিক ও ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত

(খ) মৌলিক ও নিয়মমাফিক সিদ্ধান্ত

(গ) পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত এবং

(ঘ) অপরিকল্পিত বা নতুন সিদ্ধান্ত।

আবার Griffith সিদ্ধান্ত গ্রহণকে নিম্নলিখিত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন—

(ক) অন্তর্বর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Interim decision)

(খ) পুনর্বিচারভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Decision on reconsideration)

(গ) সৃষ্টিশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Creative decision)

সময় অনুসারে, পরিস্থিতির বাস্তবভিত্তি পর্যালোচনা করে সাংগঠনিক, ব্যক্তিগত বা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে থাকে। দৈনন্দিন কাজের ক্ষেত্রে কিছু নিয়মমাফিক সিদ্ধান্ত (Routine decision) নিতে হয় যা মূলত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট লক্ষ্য, কর্মপদ্ধতি ও পরিকল্পনার পরিচায়ক হয়ে ওঠে। কখনও প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য নেতৃত্বকে প্রভাবিত করে আবার কখনও বা নেতার গুণেই প্রতিষ্ঠান পরিচিতি পায়। গতানুগতিকভাবে বহু সিদ্ধান্ত চটজলদি এবং অপরিকল্পিতভাবে নেওয়া হলেও মূলত পরিকল্পিত সিদ্ধান্তই কোনো প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতির মূল পাথেয়। এই পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত কতটা সৃষ্টিমূলক হবে তা নির্ভর করে নেতৃত্বের গুণগত মানের ওপর।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াটি Griffith ও Dewey-এর মত অনুসারে নিম্নরূপ—

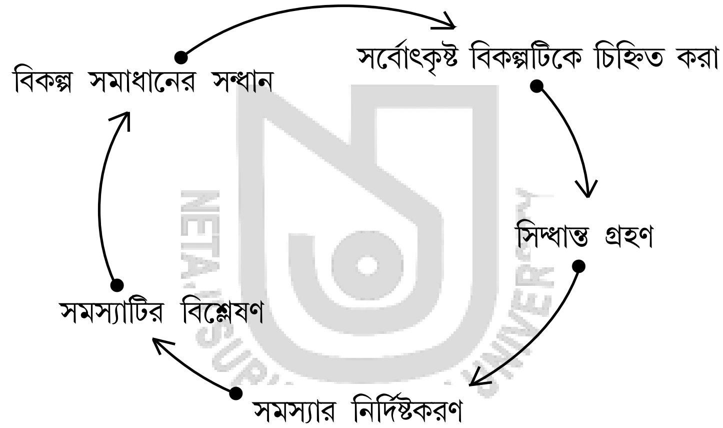

চিত্র ২.১ সিদ্ধান্ত গ্রহণের চক্রাকার ক্রমপর্যায়

সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটি কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ধাপে সম্পন্ন হয়ে থাকে। ধাপগুলি নিম্নরূপ—

- সমস্যাটি বিবৃত করা।
- সমস্যার যতগুলি বিকল্প সমাধান হতে পারে সেগুলি নির্বাচিত করা।
- সর্বোৎকৃষ্ট বিকল্পটিকে চিহ্নিত করা।
- সমস্যাটিকে চিহ্নিত করা, তার সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করা এবং তার সীমাবদ্ধতা কতদূর তা বের করা।
- সমস্যাটিকে বিশ্লেষণ করা এবং মূল্যায়ন করা।
- প্রয়োজন অনুযায়ী যে শর্তাবলির মধ্যে সমস্যাটিকে বিচার করতে হবে সেগুলি উপস্থাপিত করা।

- তথ্য সংগ্রহ করা।
- কাঙ্খিত সমাধানগুলিকে উদ্‌ঘাটিত করা।
- কাঙ্খিত সমাধানগুলিকে নিয়ম নিগড়ে (Programme) বেঁধে তাদের রূপায়িত করা।
- সমস্যার কাঙ্খিত সমাধানের মধ্যে যে কার্যাবলি আছে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা।
- ফলাফলকে হিসাব করে বের করা।

২.৪ শিক্ষা প্রশাসনের মূল তত্ত্বসমূহ (Main Theories of Educational Administration)

শিক্ষা প্রশাসনের মূল তত্ত্বগুলিকে প্রধানত তিনটি পর্যায়ে আলোচনা করা যায়—

(১) ক্ল্যাসিকাল তত্ত্ব (Classical Theory) যা প্রধানত আমলাতান্ত্রিক, গতানুগতিক, প্রশাসনিক উদ্যোগ বা বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নীতি অনুসরণ করে চলে।

(২) নয়া ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব (Neo-classical Theory) যা প্রধানত মানবিক সম্পর্ক, প্রশাসনিক স্তরে ব্যক্তি বিশেষের গুরুত্ব বা ব্যাবহারিক উদ্যোগের ভিত্তিতে আলোচিত হয়।

(৩) আধুনিক ব্যবস্থাপনার তত্ত্ব (Modern Management Theory) যা প্রধানত, আধুনিক ম্যানেজমেন্ট তত্ত্ব, সিস্টেমস তত্ত্ব (Systems Theory) ও কনটিনজেন্সি তত্ত্বের (Contingency Theory) ভিত্তিতে আলোচিত হয়।

যে-কোনো তত্ত্ব অনুসারেই শিক্ষা প্রশাসনিক উদ্যোগ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা গেলেও এদের মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কিন্তু একটাই। তা হল—প্রশাসনিক উদ্যোগের সাফল্য অর্জন করা।

২.৪.১. ক্ল্যাসিকাল তত্ত্ব (Classical Theory)

এই তত্ত্বটি প্রধানত বিগত দুই শতকের অত্যন্ত বহুল প্রচলিত প্রশাসনিক উদ্যোগ যা Adam Smith-এর ধারণা অনুসারে গৃহীত হয়েছিল। যেখানে কর্মচারীদের দক্ষতাবৃদ্ধির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উদ্যোগের কথা বলা হয়েছিল। পরবর্তীকালে সমাজবিজ্ঞানী Schin এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন যে—

- সাধারণ, কর্মচারীরা আর্থিক সুযোগসুবিধা দ্বারা উৎসাহিত বোধ করে।
- কর্মচারীবৃন্দের পরোক্ষ উৎসাহপ্রদানের দ্বারা সংগঠনের মূল লক্ষ্য সহজেই নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। কাজেই অর্থনৈতিক সুবিধাপ্রদান এক্ষেত্রে সংগঠনের সাফল্যে বড়ো ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।
- অকারণ মানসিক দ্বন্দ্ব বা প্রক্ষোভিক আচরণগত বহিঃপ্রকাশ এড়িয়ে চলা বাঞ্ছনীয় কারণ তা অর্থনৈতিক সুবিধাপ্রদানের বিরোধী শক্তি রূপে ক্রিয়া করে।
- কর্মচারীদের ব্যাবহারিক দৃষ্টিকোণ বিশেষভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। কারণ তা যে-কোনো প্রশাসনিক উদ্যোগকে সাফল্যমণ্ডিত করতে পারে অথবা সেই উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে।

এই ক্ল্যাসিকাল তত্ত্ব ব্যবস্থাপনার নীতি অনুসারে মূলত তিন ধরনের হয়—

(ক) বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার তত্ত্ব (Scientific Management Theory)

(খ) প্রশাসনিক নীতি (Administrative Principle)

(গ) আমলাতন্ত্রিক সংগঠন তত্ত্ব (Bureaucratic Organisation Theory)

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার তত্ত্ব (Theory of Scientific Management) ঃ এই তত্ত্ব Fredrick. W. Taylor দ্বারা উদ্ভাবিত, যাঁকে এই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক বলা হয়। পরবর্তীকালে Frauk, Lilian Gilbreath, Henry L. Gautt এবং Harrington Emerson প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীদের দ্বারা এই তত্ত্ব আরও সমৃদ্ধ হয়। এই তত্ত্ব অনুসারে নিম্নলিখিত মূলনীতিগুলি আলোচিত হয়ে থাকে—

- বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে বিগত অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও সিদ্ধান্তগ্রহণ সবকিছুই এই তত্ত্বের মূল্যায়নে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।
- যে-কোনো কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট সময়, কর্মপদ্ধতি ইত্যাদি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে চালিত হয়।
- প্রশাসনের নতুন কোনো উদ্যোগ গ্রহণকে খুব বেশি উৎসাহিত করা হয় না এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গৃহীত প্রচলিত পদ্ধতিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়।
- কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষানবিশি ব্যবস্থা প্রচলিত ব্যবস্থা অনুসারে করা হয়ে থাকে এবং আলাদা কোনো প্রথাগত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না।

- তত্ত্ববধায়কদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যার ফলে দলগত কাজে উৎসাহত প্রদান করা হয় এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগকে প্রাধান্য দেওয়া হয় না।
- প্রত্যেকটি কাজকে বৈজ্ঞানিকভাবে বিভিন্ন উপএককে ভেঙে নেওয়া হয় যাতে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয়ে সমান গুরুত্ব আরোপ করা সম্ভব হয়।
- উপযুক্ত কাজের জন্য উপযুক্ত দক্ষ কর্মী নির্বাচন এবং তাদের পারস্পরিক বোঝাপড়া বজায় রাখা প্রশাসনিক সাফল্যলাভের মূল কথা।

প্রশাসনিক নীতি (Administrative Principle) ঃ এই তত্ত্ব প্রধানত Henry Fayol-এর দ্বারা গৃহীত। যা পরবর্তীকালে Mary Parker Follet এবং Lyndall Urwick দ্বারা সমৃদ্ধ হয়। পরবর্তীক্ষেত্রে এই তত্ত্ব Max Weber-এর উদ্যোগে পুনর্গঠিত হয়ে এর পরিবর্তিত রূপ আমলাতান্ত্রিক সংগঠন তত্ত্ব হিসাবে পরিচিত হয়।

Henry Fayol-এর প্রশাসনিক নীতির মূল কথাগুলি হল—

- ম্যানেজারের দৃষ্টিকোণ থেকে নেওয়া প্রশাসনিক সিদ্ধান্তই মূল কথা। তাই সংগঠনের চালিকাশক্তি।
- মূল ছটি ক্ষেত্রে ম্যানেজার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন যেমন,
  —প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়া (Technical Operations)
  —বাণিজ্যিক প্রক্রিয়া (Commercial Operations)
  —আর্থিক প্রক্রিয়া (Financial Operations)
  —নিরাপত্তার প্রক্রিয়া (Security Operations)
  —হিসাবরক্ষার প্রক্রিয়া (Accounting Operations)
  —ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া (Managerial Operations)

মূলত, এই কাজগুলির জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশদান, সহযোগিতা, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ।

আমলাতান্ত্রিক সংগঠন তত্ত্ব (Theory of Bureaucratic Structure) ঃ Max Weber প্রধানত Henry Fayol-এর নীতি দ্বারা প্রভাবিত হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার নিজস্ব কিছু চিন্তাভাবনার ছাপ রেখেছেন। তাঁর আমলাতান্ত্রিক সংগঠন তত্ত্বের মূল কথা হল—

- শ্রমের বিভাজন মূলত কর্মদক্ষতার ওপর ভিত্তি করেই হওয়া উচিত।
- ক্ষমতার সুস্পষ্ট ক্রমোচ্চপর্যায় (hierarchy) কর্তৃত্বের স্তর-কে নির্দেশ করে। এর দ্বারা প্রত্যেক স্তরে নির্দিষ্ট ক্ষমতার গণ্ডি স্পষ্ট ও সীমিত হয়।
- কর্মচারীদের কর্তব্য এবং অধিকার সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট নিয়ম থাকা বাঞ্ছনীয়।
- নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গৃহীত কালজয়ী কিছু পদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- কর্মচারীদের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রাখা প্রশাসনিক দক্ষতার অন্যতম প্রধান শর্ত।
- কারিগরি দক্ষতা ও উৎকর্ষ অনুসারে কর্মচারীদের নিয়োগ ও উন্নতি নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত।

এই পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট নিয়মনীতি অনুসারে কাজ হয় বলে কোনো ব্যক্তিগত পছন্দ বা অপছন্দের সুযোগ সীমিত। নির্দিষ্ট নিয়ম বা নীতি অনুসারে একই ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করে সকল ধরনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং মানবসম্পদের অপচয় সবচেয়ে কম ঘটে।

কোনো পদ্ধতিই যেমন ত্রুটিমুক্ত হতে পারে না তেমনই এই পদ্ধতিতে ফিতের ফাঁস, অতিরিক্ত কাগজপত্রভিত্তিক কাজ এবং ধীরগতিকে প্রায় সকলেই সমালোচনা করে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত নিয়ম মেনে চলতে গিয়ে কোনো নির্দিষ্ট কাজের যথাযথ উৎকর্ষসাধন সম্ভব হয় না এবং কর্মচারীরা যন্ত্রের মতো দৈনন্দিন কাজ করে থাকে যা তাদের পক্ষেও একঘেয়েমির সৃষ্টি করে।

২.৪.২. নয়া ক্ল্যাসিকাল তত্ত্ব (Neo Classical Theory)

এই তত্ত্বের মূল প্রবক্তা হলেন Elton Mayo এবং তাঁর তত্ত্বের ভিত্তি হল Hawthorne পরীক্ষানিরীক্ষা। এই পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছিলেন যে ভালো সুযোগসুবিধা, কর্মক্ষেত্রের সুন্দর পরিবেশ এবং সহকর্মীদের একে অপরের প্রতি সহযোগিতা ও সহমর্মিতার সম্পর্ক কর্মচারীদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এই তত্ত্বের মূল কথা হল কর্মচারীদের মানবিক সম্পর্ক, মানসিক গঠন, প্রেষণা, কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ (working climate) ইত্যাদির উন্নতি ঘটিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি। Abraham Maslow-র মত অনুসারে মানুষের যে পাঁচটি বিভিন্ন স্তরের চাহিদা আছে তার পূরণ ধাপে ধাপে করা সম্ভব এবং তার ফলে কর্মচারীদের প্রেষণার (Motivation) বৃদ্ধি হয় আর সেই সঙ্গো উৎপাদনশীলতা (Productivity) বৃদ্ধি পায়। এখানে কর্মীদের একজন সামাজিক মানুষ হিসাবে দেখা হয় যারা পারস্পরিক উন্নত সম্পর্কের মাধ্যমে সহযোগিতা, সমন্বয় ও সহমর্মিতার সাহায্যে সমগ্র

প্রতিষ্ঠানের উৎকর্ষসাধন করে থাকে। তাদের নিজস্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রগুলি যদি আনন্দ ও তৃপ্তিদায়ক হয় (job satisfaction) তবে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎকর্ষসাধন ঘটে। যে-কোনো শিক্ষা প্রশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে এই ভূমিকা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন Katz, Maccoby, Morse এবং Ohio State University-র গবেষকগণ। এঁদের মতে দুটি মূল শর্ত এই প্রশাসনিক নেতৃত্বের দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ তৈরি করে।

- সুবিবেচনা (Consideration) ঃ নেতা ও কর্মীর পারস্পরিক সম্পর্ক, বিশ্বাস ও আস্থা তৈরি হলে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সঙ্গে সুবিবেচকের মতো আচরণ করে।
- উদ্যোগবিষয়ক গঠন (Initiating Structure) ঃ একটি নির্দিষ্ট কর্ম পরিবেশের সৃষ্টি করা যেখানে প্রত্যেক কর্মী তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং প্রত্যেকেই নিজের উদ্যোগে করণীয় কাজ সম্পন্ন করে।
- আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক (Inter-personal relationship) ঃ ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক উন্নত হলে এই তত্ত্ব অনুসারে প্রশাসনিক সাফল্য অর্জন করা মোটেই কঠিন নয়।

২.৪.৩. আধুনিক ব্যবস্থাপনার তত্ত্ব (Modern Management Theory)

আধুনিক ব্যবস্থাপনার তত্ত্বগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য তত্ত্বগুলি হল—

(১) অভিজ্ঞতাভিত্তিক তত্ত্ব (Empirical Theory) যা Earnest Dale-এর নামকরণ অনুসারে ক্রিয়া সম্পাদন তত্ত্ব (Operational Theory) বলেও পরিচিতি। এই তত্ত্ব অনুসারে অতীতের অভিজ্ঞতা, তত্ত্ব, তথ্য ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি স্থির করা হয়।

(২) সামাজিক ব্যবস্থা তত্ত্ব (Social System Theory) ঃ Chester Barnard একে একপ্রকার ব্যবস্থাপনার তত্ত্ব বা Management Theory হিসাবে উপস্থাপিত করেন। এখানে একই কাজে নিয়োজিত একদল কর্মীর পারস্পরিক সহযোগিতা ও উদ্যমের একমুখীকরণের (orientation) মাধ্যমে মূল প্রশাসনিক উদ্দেশ্য পূরণ করা হয়।

(৩) সমাজ-প্রযুক্তি ব্যবস্থা তত্ত্ব (Socio-technical System Theory) ঃ England-এর Tavistock Institute-এ E. L. Trist এবং তাঁর সহযোগীরা এই তত্ত্বের প্রস্তাব করেন। যেখানে তত্ত্বের মূল কথাটি ছিল মানুষ ও যন্ত্রের সঠিক সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত সাফল্য এবং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রদ্ধতির প্রয়োগ নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের চেষ্টা।

(৪) সিদ্ধান্ত তত্ত্ব (Decision Theory) ঃ যার মূল কথাগুলি এই এককের গোড়ায় আলোচিত হয়েছে। যেখানে নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য অনুসারে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

(৫) কার্যপরম্পরা ও পরিস্থিতি অভিমুখ তত্ত্ব (Contingency or Situational Approach Theory) ঃ যা Taylor এবং Gilbreth প্রথম প্রস্তাব করেন। এই তত্ত্ব অনুসারে প্ররিস্থিতি বিচার করে প্রশাসন পরিচালনা করা হয়। যা পরে বিশদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

(৬) ব্যবস্থাপকের ভূমিকা তত্ত্ব (Managerial Role Theory) ঃ Henry Mintzberg প্রস্তাব করেন প্রশাসনের ক্ষেত্রে Manager-এর ভূমিকা মুখ্য বলে বিবেচিত হয়। কারণ তিনি এমন একজন ব্যক্তি যিনি লক্ষ্য স্থির করেন, কর্মপদ্ধতি নির্বাচন করেন, নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করেন, মানুষের সঙ্গো মানুষের সম্পর্ক ঠিক রাখেন, প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করেন এবং নির্দিষ্ট নীতি, সম্পদ ও সময় বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

(৭) সক্রিয়তার অভিমুখ তত্ত্ব (Operational Approach Theory) ঃ P. W. Bridgman-এর মত অনুসারে এই তত্ত্ব গঠিত। এই তত্ত্বে কোনো ক্রিয়ার সুনির্দিষ্ট বিভাজন, দায়িত্ব বণ্টন, কর্তব্যপালন, সময়সীমা ও তার নিয়ন্ত্রণ এবং দক্ষ কর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

(৮) তন্ত্র অভিমুখ তত্ত্ব (Systems Approach Theory) ঃ এই তত্ত্বটির কিছুটা বিশদ বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

তন্ত্র অভিমুখ তত্ত্ব (System Approach Theory) ঃ এই তত্ত্ব প্রাথমিকভাবে Chester. I. Barnard-এর মস্তিষ্ক প্রসূত হলেও পরবর্তীক্ষেত্রে এর বহু রূপান্তরসাধন করেন Ludwig Von Bertalanffy—যাঁকে এই তত্ত্বের জনক বলা হয়। এই তত্ত্ব অনুসারে বিভিন্ন উপাদানগুলির একত্রে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত একটি system রূপে দেখার কথা বলা হয়েছে। এখানে শুধুমাত্র কোনো একক উপাদানের চেয়েও সব এককগুলির সমষ্টিগত রূপ ও তার ক্রিয়া অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্ব লাভ করেছে। এখানে প্রতিটি উপাদানই একে অপরের সঙ্গো সম্পর্কযুক্ত এবং পারস্পরিক সংযুক্তির মাধ্যমে সব উপাদানগুলি একত্রে ক্রিয়া করে কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসাধনে ব্রতী হয়। এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

- প্রত্যেকটি system বা তন্ত্রের অনেকগুলি উপতন্ত্র (subsystem) থাকে যা একে অপরের সঙ্গো সম্পর্কযুক্ত।
- প্রতিটি সিস্টেম একটি বৃহত্তর সামাজিক সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে যা একত্রিত হয়ে একটি সমগ্র সামাজিক ক্ষেত্রকে পরিচালনা করে থাকে।

- এরা অপেক্ষাকৃত গভীর ও জটিল সম্পর্কের বন্ধনে পরস্পর যুক্ত থাকে এবং প্রত্যেকটি সাবসিস্টেম মূল উদ্দেশ্য পালনে তার নির্দিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।
- প্রত্যেকটি সিস্টেম তার প্রয়োজনীয় শক্তি বা তথ্য আহরণ করার জন্য বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে যা বৃহত্তর পরিবেশের অঙ্গ।
- বিভিন্ন শক্তির পারস্পরিক সমতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সিস্টেম তার অন্তর্গত বিভিন্ন শক্তিগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব কমিয়ে আনার জন্য সচেষ্ট হয়।
- কোনো একটি সিস্টেম একা একা কাজ করতে পারে না। তার জন্য দরকার হয় অন্যান্য সম্পর্কযুক্ত সিস্টেমগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা।

Systems বলতে সাধারণত দুই ধরনের সমন্বয়কে বোঝায়।

প্রথমত, মুক্ত তন্ত্র (Open System)

এখানে অন্তিম উৎপাদন প্রাথমিক উৎপাদনকে কোনোভাবেই প্রভাবিত করে না বা কোনো নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে না।

দ্বিতীয়ত, বন্ধ তন্ত্র (Closed System)

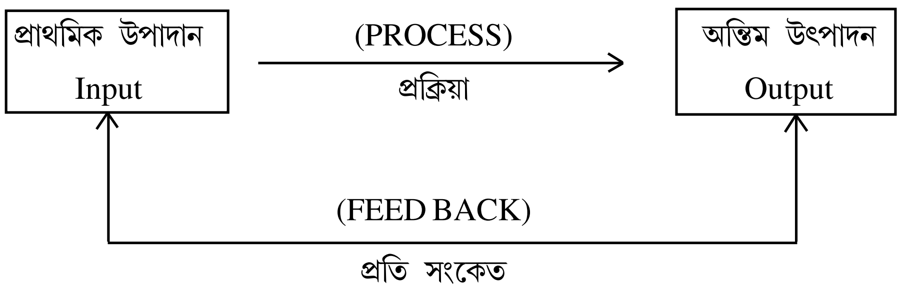

যেখানে, সুনির্দিষ্ট প্রতি সংকেতের মাধ্যমে প্রাথমিক উপাদানের গুণগত মান বজায় রাখা সহজতর হয়। আবার প্রাথমিক উপাদানের গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেলে অন্তিম উৎপাদনের মানও বৃদ্ধি পায়। মুক্ততন্ত্রে একবার উৎপাদন প্রক্রিয়া শেষ হয়ে কোনো কিছু উৎপাদিত হলে আর কোনোভাবেই তাকে

নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না। অথচ বদ্ধতন্ত্রের সুবিধা এই যে প্রতি সংকেতের সাহায্যে অন্তিম উৎপাদনের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়।

আকস্মিকতা অভিমুখ তত্ত্ব (Contingency Approach Theory) ঃ এই তত্ত্ব প্রাথমিকভাবে Fiedler দ্বারা প্রস্তাবিত হলেও পরবর্তীকালে তিনি Hersey এবং Blanchard-এর সহায়তায় এর অনেক পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করেন। এই তত্ত্বের তিনটি মূল উপাদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

- নেতৃত্বের উপযোগিতা।
- নেতৃত্বের পারস্পরিক পার্থক্য।
- নির্দিষ্ট পরিস্থিতির বিচারে নেতৃত্বের ভূমিকা বদল।

এই তত্ত্ব প্রধানত নেতৃত্বের দায়িত্ব ও গুণাবলিকে বিশ্লেষণী দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করে থাকে এবং উদাহরণ সহযোগে বোঝানো যায় যে কীভাবে পরিস্থিতির বদল ঘটলে নেতৃত্বের ভূমিকা সাময়িকভাবে পালটে যেতে পারে। ধরা যাক, কোনো একটি দামি গাড়ি চড়ে কোনো বড়ো কর্তা অনেক দূরের কোনো সংস্থার মালিকের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন। গাড়িটি চালাচ্ছে একজন সাধারণ কর্মচারী যে ওই সংস্থায় ড্রাইভার রূপে নিয়োজিত। উভয়ের দায়িত্ব, নেতৃত্ব এবং গুণগত কার্যক্ষমতার মধ্যে সাধারণ স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কোনো তুলনাই চলে না। কিন্তু জনমানবহীন হাইওয়েতে হঠাৎ কোনো কারণে গাড়িটি খারাপ হয়ে গেলে ওই বিশেষ পরিস্থিতির বিচারে সাময়িকভাবে গাড়িটিকে পুনরায় চালু করার দায়িত্বভার এসে বর্তায় সেই সাধারণ ড্রাইভারটির ওপরে। এক্ষেত্রে ওই পরিস্থিতিতে ওই ড্রাইভারের নেতৃত্বগুণ ও কর্মদক্ষতা পিছনের সিটে বসে থাকা বড়ো কর্তাটির তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তত্ত্বের এই প্রকারটিকে পরিস্থিতিভিত্তিক নেতৃত্বের অভিমুখ (situational leadership approach) বলা হয়ে থাকে।

অন্য আর একটি দৃষ্টিকোণ থেকে Feidler L.P.C. বা Last Preferred Co-worker বিষয়টি সম্বন্ধে ধারণা দিয়েছেন যা এই তত্ত্বের অন্য আর একটি রূপ। নির্দিষ্ট কাজ ও দায়িত্ব অনুসারে একজন নেতা তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে সংস্থার কর্মচারীদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করে থাকেন—যেখানে কোনো কর্মী তার দক্ষতার স্বীকৃতি পায় আবার কাউকে দক্ষতার অভাবে ওই নেতার বা নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে L.P.C. বা সর্বাপেক্ষা কম দক্ষ কর্মীর পরিচয়ে সীমাবদ্ধ থাকতে হয়।

২.৫ সারসংক্ষেপ (Summary)

শিক্ষা প্রশাসনের কার্যকারিতা নির্ভর করে দুটি প্রধান বিষয়ের ওপর। তার একটি হল নেতৃত্ব এবং অপরটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ। অনেক ধরনের নেতৃত্বের মধ্যে অন্যতম স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব, গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব, আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্ব। একনায়কতন্ত্রী নেতৃত্ব, অবাধ নেতৃত্ব, কর্মসম্পাদনী নেতৃত্ব ইত্যাদি। এর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই নেতা এবং কর্মচারীদের মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব বণ্টন প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য দরকার হয় উপযুক্ত সময়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের। যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন হয় তার মধ্যে আছে সাংগঠনিক ও ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত, মৌলিক ও নিয়মমাফিক সিদ্ধান্ত, পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত এবং অপরিকল্পিত বা নতুন সিদ্ধান্ত। অপরপক্ষে গ্রিফিথ তিনপ্রকার সিদ্ধান্তের কথা বলেছেন—অন্তর্বর্তী সিদ্ধান্ত, পুনর্বিচারভিত্তিক সিদ্ধান্ত এবং সৃষ্টিশীল সিদ্ধান্ত। সমস্ত পরিকল্পিত সিদ্ধান্তই ধাপে ধাপে গ্রহণ করা হয়। সমস্যার বিবরণ, বিকল্প সমাধান বিচার, প্রয়োজনীয় ও সংশ্লিষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণ, বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন, তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদির মাধ্যমে ধাপে ধাপে সমস্যার সমাধান করা এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

শিক্ষা প্রশাসনে নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং সেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার উদ্দেশ্যপূরণ করার প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করার জন্য শিক্ষা প্রশাসনের অনেকগুলি তত্ত্ব প্রশাসন বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত করেছেন। এর মধ্যে প্রধান চারপ্রকার তত্ত্ব যথাক্রমে, ক্ল্যাসিকাল তত্ত্ব, নয়া ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব, আধুনিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব ও আকস্মিকতা অভিমুখ তত্ত্ব নামে পরিচিত।

ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন অ্যাডাম স্থিম। এই তত্ত্বে কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি করে প্রতিষ্ঠানের কাজ পরিচালিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। তিনপ্রকার ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বের নাম—বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার তত্ত্ব, প্রশাসনিক নীতি ও আমলাতান্ত্রিক সংগঠন তত্ত্ব। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার তত্ত্ব বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মবিশ্লেষণ (Job analysis), কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ও দক্ষকর্মী নির্বাচন, তত্ত্বাবধান ও দলগত কাজে উৎসাহদান ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে। প্রশাসনিক নীতিতে বলা হয়েছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকর্তা ব্যবস্থাপক (manager)। প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়া, বাণিজ্যিক প্রক্রিয়া, আর্থিক প্রক্রিয়া, নিরাপত্তার প্রক্রিয়া, হিসাবরক্ষার প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া এই ছয়টি ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপককে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

প্রশাসনিক কাজে আমলাতান্ত্রিক সংগঠন তত্ত্ব একটি বহুল প্রচলিত তত্ত্ব যা হেনরি ফেওল-এর নীতি নামে পরিচিত। এই তত্ত্বে আমলাতন্ত্র অর্থাৎ বিভিন্ন পদস্থ কর্মচারীদের ওপর পূর্বনির্ধারিত দায়িত্ব বন্টন ও দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে প্রশাসন পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া আমলাদের বিভিন্ন স্তরে ভিন্ন রকম। নয়া ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বে কর্মীদের সুবিধা সম্বন্ধে সুবিবেচনা এবং উদ্যোগ প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে প্রশাসন পরিচালনার কথা বলা হয়েছে। সবচেয়ে ভালো প্রশাসক তিনিই যিনি কর্মীদের, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি যেমন সজাগ দৃষ্টি রাখেন, তেমনি প্রত্যেকের নিকট থেকে কাজ বুঝে নেওয়ার ব্যাপারে সমান উদ্যোগী বা সচেতন।

আধুনিক ব্যবস্থাপনার তত্ত্বে আট রকমের তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে। যেমন, অভিজ্ঞতাভিত্তিক তত্ত্ব, সামাজিক ব্যবস্থা তত্ত্ব, সমাজপ্রযুক্তি ব্যবস্থার তত্ত্ব, সিদ্ধান্ত তত্ত্ব, কার্যপরম্পরা ও পরিস্থিতি অভিমুখ তত্ত্ব, ব্যবস্থাপকের ভূমিকা তত্ত্ব, সক্রিয়তা অভিমুখ তত্ত্ব এবং তন্ত্র অভিমুখ তত্ত্ব। এর মধ্যে তন্ত্র বা system কে একাধিক উপতন্ত্রের সমন্বয় হিসাবে ধরে নিয়ে মুক্ত ও বদ্ধ এই দুইপ্রকার তন্ত্রের কথা বলা হয়েছে। আর পরিস্থিতি অভিমুখ তত্ত্বে উপস্থিত পরিস্থিতির দাবি মেনে এবং কার্য পরম্পরা পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

২.৬ প্রশ্নাবলি (Questions)

১। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) শিক্ষা প্রশাসনের তত্ত্বের প্রয়োজন কেন ?

(খ) ম্যাকফারল্যান্ডের মতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া কয়টি শ্রেণিতে বিভক্ত ?

(গ) ক্ল্যাসিকাল তত্ত্ব কী ?

(ঘ) প্রশাসনিক নীতি কাকে বলে ?

(ঙ) আমলাতান্ত্রিক তত্ত্বের মূল নীতি কী ?

(চ) সামাজিক ব্যবস্থা তত্ত্ব কাকে বলে ?

(ছ) তন্ত্র অভিমুখ তত্ত্ব কাকে বলে ?

২। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) শিক্ষা প্রশাসনে নেতৃত্বের প্রভেদগুলি উল্লেখ করুন।

(খ) সিদ্ধান্ত গ্রহণের অর্থ কী? সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর কীভাবে প্রশাসন ব্যবস্থা নির্ভর করে?

(গ) আমলাতান্ত্রিক সংগঠন কথাটি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) প্রশাসনিক নীতিতে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হয়?

(ঙ) নয়া ক্ল্যাসিকাল তত্ত্ব কাকে বলে?

(চ) সমাজপ্রযুক্তি ব্যবস্থা তত্ত্বের মূল কথা কী?

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) শিক্ষা প্রশাসনের ক্ল্যাসিকাল তত্ত্ব বলতে কী বোঝায়? ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করুন। এই তত্ত্ব বর্তমানে কতটা প্রযোজ্য?

(খ) তন্ত্র অভিমুখ তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করুন। এই তত্ত্বকে কেন আধুনিক প্রশাসনিক তত্ত্ব বলা হয়?

(গ) শিক্ষা প্রশাসনে নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এই দুই সম্পর্কিত বিষয়ের ওপর একটি রচনা লিখুন।

একক ৩ ❑ সংস্থার ধারণা (Concept of Organisation)

গঠন (Structure)

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ উদ্দেশ্য

৩.৩ সংস্থার ধারণা

৩.৪ সংস্থার নীতি

৩.৪.১ বিভাগীকরণ

৩.৪.২ কর্মী নিয়োগ

৩.৫ কর্তৃত্ব

—গতানুগতিক প্রাচীনপন্থী কর্তৃত্ব

—আইনি কর্তৃত্ব

—আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের কর্তৃত্ব

—গ্রহণীয়তার তত্ত্ব

—দক্ষতার তত্ত্ব

৩.৬ ক্ষমতার প্রয়োগ ও কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ

৩.৭ প্রতিষ্ঠানের স্বশাসন

৩.৭.১ স্বপরিচালিত সংস্থা

৩.৮ সাংগঠনিক কাঠামো

৩.৯ সারসংক্ষেপ

৩.১০ প্রশ্নাবলি

৩.১ প্রস্তাবনা (Introduction)

শিক্ষা প্রশাসনের লক্ষ্য ও তত্ত্বে বিভিন্ন স্থানে প্রশাসক, ব্যবস্থাপক, প্রতিষ্ঠান, নেতৃত্ব ইত্যাদি কথাগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রশাসন যেহেতু একটি উদ্দেশ্যমুখী ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যার উদ্দেশ্য

হল নেতৃত্ব ও উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য পূরণ করা। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে এক্ষেত্রে শিক্ষা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কী, তার উপাদান ও ক্রিয়াগুলি কী কী? এই বিষয়টিকে অবলম্বন করে বর্তমান এককটি লেখা হয়েছে। একটি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান থাকলে তবেই তার কর্মীরা সেখানে একই উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করবেন। প্রশাসক বা ব্যবস্থাপকরা তাঁদের সুপরিচালনার মাধ্যমে কর্মীদের কাজের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য পূরণ করবেন।

সংস্থার ধারণা মূলত পাশ্চাত্য জগতের অবদান হলেও প্রাচীন ভারতবর্ষে এই ধারণা অপরিচিত ছিল না। ভারতে বৌদ্ধযুগে নালন্দা ও বৌদ্ধ সংঘগুলি সুসংগঠিত সংস্থা হিসাবে পরিচালিত হত। তক্ষশিলার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু বর্তমান যুগে নানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে সংস্থার ধারণা জটিলতর হয়েছে, প্রশাসনিক ব্যবস্থাও জটিলতর হয়েছে। সেজন্য কোনো একটি সংস্থার নেতৃত্বে থাকা ব্যক্তিদের পক্ষে অর্থাৎ শিক্ষা প্রশাসকদের পক্ষে শুধুমাত্র তাঁর নিজের সংস্থার সংগঠনটিকে জানাই যথেষ্ট নয়। তাঁর জানা দরকার সংগঠনের প্রকৃতি ও অন্যান্য বিষয়গুলি। এই জন্যই সংস্থার ধারণা (Concept of Organisation) পাঠ করা দরকার।

৩.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- সংস্থা কথাটির প্রশাসনিক অর্থ অনুধাবন করতে পারবেন।
- সংস্থার নীতিগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিভাগীকরণের তাৎপর্য বলতে পারবেন।
- সংস্থার কর্তৃত্ব সম্বন্ধে জানতে পারবেন।
- ক্ষমতার ও কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রতিষ্ঠানের স্বশাসনের প্রয়োজনীয়তা ও ধারণা সম্বন্ধে বলতে পারবেন।
- সাংগঠনিক কাঠামো কাকে বলে ও তার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৩.৩ সংস্থার ধারণা (Concept of Organisation)

কোনো সংস্থার গঠনপ্রক্রিয়া ও তার কার্যকরিতা সঠিকভাবে বুঝতে গেলে আমাদের এই ধারণাটিকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। আধুনিক সভ্যতায় কোনো সংস্থার সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া আমরা বাঁচতে পারিনা। Etzioni-র ভাষায় উপযুক্ত, দক্ষ সংস্থার উপস্থিতি আমাদের সমাজকে সমৃদ্ধ করে, উন্নত করে, আমাদের সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে, আমাদের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করে এবং সর্বোপরি আমাদের গণতান্ত্রিক ভাবধারার বাস্তব প্রয়োগ ঘটাতে সাহায্য করে। তাঁর ভাষায়, "We are born in organisations, educated by organisations and most of us spend much of our time working for organisation."

কোনো একটি সংস্থাকে দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝার চেষ্টা করা যায়—(১) মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এবং (২) পদ্ধতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে।

Ralph. C. Davis সংস্থা বলতে কিছু মানুষের সমষ্টিকে বুঝিয়েছেন যারা কোনো নির্দিষ্ট নেতৃত্বের অধীনে কাজ করে সমষ্টিগতভাবে সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে কোনো একটি সাধারণ উদ্দেশ্য পূরণের চেষ্টা করে।

Oliver Sheldon কোনো সংস্থার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সেই সংস্থার কার্যপদ্ধতির ওপর জোর দিয়েছেন। কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে ঊর্ধ্বতন বা অধস্তন কর্মীদের সম্মিলিত চেষ্টার মধ্যে প্রয়োজনীয় দক্ষতা, নিয়মানুবর্তিতা, পারস্পরিক সম্পর্ক ও বোঝাপড়া, কার্যপ্রণালীর বিজ্ঞানসম্মত ধাপ অনুসরণ ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি নির্দিষ্ট সংস্থার কার্যপ্রণালীর ব্যাখ্যা করেছেন এবং এইসব বৈশিষ্ট্যের সম্মিলিত রূপকেই সংস্থার পরিচয় হিসাবে তুলে ধরেছেন।

যে-কোনো একটি সংস্থা একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়েই গড়ে ওঠে যার জন্য কিছু প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন মানুষকে কিছু সুনির্দিষ্ট কার্যপদ্ধতি মেনে চলতে হয় যাতে সুষ্ঠুভাবে ওই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য পূরণ হয় ও সুনাম হয়।

৩.৪ সংস্থার নীতি (Principles of Organisation)

যে-কোনো সংস্থা কয়েকটি সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে সংগঠিত হয়ে থাকে। নীতিগুলি হল—

● **উদ্দেশ্যের নীতি (Principle of Goal)** ঃ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের সঠিক নির্বাচন যা

বাস্তবোচিত হবে এবং নির্দিষ্ট সময় অনুসারে সেই উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে। অর্থাৎ অবাস্তব লক্ষ্য নিয়ে এগোলে সেই সংস্থার ভরাডুবি অবশ্যম্ভাবী।

● **সংহতির নীতি (Principle of Integration)** ঃ কোনো সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে সবচেয়ে অধস্তন কর্মচারীটিরও মূল উদ্দেশ্য এবং কাজের ধারা যেন সংস্থাটির মূল লক্ষ্যের সঙ্গো যথাযথভাবে খাপ খেয়ে যায় যাতে কার্যপদ্ধতির মধ্যে কোনো বিঘ্ন না ঘটে।

● **ব্যক্তিগত ভূমিকার নীতি (Principle of Individual Role)** ঃ প্রত্যেকটি কর্মীর সুনির্দিষ্ট ভূমিকা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। যা সাধারণভাবে গোটা সংস্থারই দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

● **সম্পর্কের নীতি (Principle of Relation)** ঃ কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় থাকলে তবেই সংস্থার কার্যপ্রণালী উন্নত হয় এবং কর্তৃপক্ষের এই বিশেষ দিকটিতে নজর দেওয়া উচিত।

● **বোঝাপড়ার নীতি (Principle of Understanding)** ঃ সংস্থার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, নির্দিষ্ট কর্তব্য, দায়িত্ব ও কাজের পরিধি সম্বন্ধে প্রত্যেকটি কর্মীকে যথেষ্ট সচেতন থাকতে হয় যাতে কোনো ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ না থাকে।

● **বিকেন্দ্রীকরণ নীতি (Principle of Decentralisation)** ঃ আধুনিক মতবাদ অনুসারে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ধারণা হলেও এর মূল অসুবিধার জায়গাটি হল একাধিক স্তর থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাপ্রদান। যা অনেকসময় প্রশাসনিক গোলযোগ (administrative chaos) সৃষ্টি করতে পারে। সেজন্য বিকেন্দ্রীকরণ ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ভারসাম্য ও যোগাযোগ থাকা দরকার।

● **দায়িত্ব বণ্টন নীতি (Principle of Delegation of Responsibility)** ঃ কর্মীদের নির্দিষ্ট দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুসারে নির্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব দেওয়া উচিত যাতে তা পালন করতে তাদের কোনো অসুবিধা না হয়।

● **কর্মী নির্বাচন নীতি (Principle of Staff Selection)** ঃ যে-কোনো কাজের ধরন, কার্যপ্রণালী ইত্যাদি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে কোনো কর্মীর পক্ষেই সেই কাজে সাফল্য পাওয়া সম্ভব নয়। তাই সঠিক কাজের জন্য সঠিক কর্মী নির্বাচন, সঠিক কর্মীগোষ্ঠীর জন্য সঠিক নেতা নির্বাচন, সঠিক হাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া যে-কোনো সংস্থার সাফল্যের মূল কথা।

● **নেতৃত্বের নীতি (Principle of Leadership)** ঃ কেবলমাত্র আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বা নির্দিষ্ট কিছু নিয়মনীতি পালন করলেই (Rule book) খুব কড়া প্রশাসক (hard task master) হওয়া যেতে পারে কিন্তু নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু প্রয়োজনীয় নমনীয়তা বা উদ্ভাবনী শক্তি ছাড়া কোনো প্রশাসন বা সংস্থা সাফল্য পেতে পারে না।

৩.৪.১ বিভাগীকরণ (Departmentation)

কোনো সংস্থার মূল নীতি নির্ধারণ থেকে শুরু করে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং মূল লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব পালন করতে হয়। আগেই বলা হয়েছে যে, সুনির্দিষ্ট কর্মদক্ষতা অনুসারে দক্ষতা অনুযায়ী নির্দিষ্ট হাতে নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া উচিত। কোনো সংস্থার পরিচালনার ক্ষেত্রে এজন্যই নির্দিষ্ট বিভাগীকরণ (departmentation) অত্যন্ত জরুরি। ধরা যাক, কোনো সংস্থায় যিনি কম্পিউটার সেন্টারের দায়িত্বে থাকবেন তাঁর দক্ষতা যেমন তথ্য ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রশ্নাতীত তেমনই তাঁর কাছে ওই সংস্থার পাঠক্রম বা পরীক্ষা সংক্রান্ত কোনো কাজ আশা করা উচিত নয়। আর্থিক বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যেমন, নির্দিষ্ট দক্ষ কর্মীদের দরকার তেমনই কোনো সংস্থার জনসংযোগের (Public relations) ক্ষেত্রটি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। কোনো সংস্থার পরিকাঠামো (Infrastructure) যাঁরা দেখবেন তাঁদের কর্মপদ্ধতি গবেষণা ও বিকাশ (research and development) বিভাগের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

৩.৪.২ কর্মী নিয়োগ (Appointment of Staff)

প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে যে-কোনো সংস্থার কর্মীদের তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়—(১) অদক্ষ কর্মী (unskilled staff), (২) অল্প দক্ষকর্মী (semi-skilled staff), (৩) দক্ষকর্মী (skilled staff)।

সাধারণভাবে বিভাগীকরণের সময় এইসব কর্মীদের বিভিন্ন দায়িত্ব অনুসারে পিরামিডের আকৃতিতে সাজানো হয়ে থাকে। সংখ্যাগত দিক থেকে যদি ধরে নেওয়া যায়, একজন দক্ষকর্মীর অধীনে চারজন অল্প দক্ষকর্মী এবং ছ'জন অদক্ষ কর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো একটি বিভাগে কাজ করে, তবে দায়িত্বের শীর্ষে থাকবেন ওই দক্ষকর্মী। নীচের চিত্রে দেখানো হয়েছে বিষয়টি।

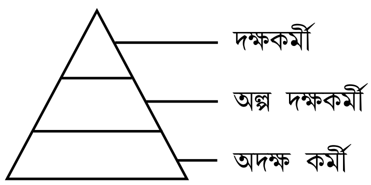

চিত্র-২ : কর্মীর দক্ষতা অনুযায়ী দায়িত্বগত অবস্থান।

সাধারণভাব, বিভিন্ন ধরনের সংস্থা তাদের নিজস্ব কর্মপদ্ধতি ও কর্মীদের সংখ্যা ও ধরন অনুসারে বিভাগীকরণ করে থাকে। প্রত্যেক বিভাগ তাদের নিজস্ব লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে ও তা পূরণের চেষ্টা করে। প্রত্যেক বিভাগের একজন করে ভারপ্রাপ্ত প্রশাসক থাকেন যাঁর ভূমিকা প্রধানত ব্যবস্থাপকের। বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রশাসকের ভূমিকার নিয়ন্ত্রণ ও যোগসূত্র স্থাপনের জন্য থাকেন কোনো ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যাঁর বা যাঁদের মূল দায়িত্ব হয় যোগসূত্র স্থাপন ও নিয়ন্ত্রণ (co-ordination and control)। কোনো সংস্থার সকল বিভাগের কার্যপদ্ধতি যদি সঠিকভাবে একমুখী (orientation in unidirectional manner) হয় তবে ওই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য পূরণ করা সহজ হয়। কোনো অর্কেস্ট্রায় সব কটি বাদ্যযন্ত্র একই সুরে বাঁধা থাকলে যেমন ওই সংগীতের মূর্ছনাকে সুরমুক্ত ও শ্রুতিমধুর করে তোলে তেমনই ওই অর্কেস্ট্রার কোনো একটি বা দুটি যন্ত্র যথাযথ বাঁধা না হলে সঙ্গীতের মূল উপস্থাপনাটিই ব্যর্থ হয়ে যায়। একটি সংস্থার সবকটি বিভাগই হল এইসব বিভিন্ন যন্ত্রগুলির মতো। যাদের সমবেত সুনিয়ন্ত্রিত ঐকতানে সাফল্য ও সুনাম সহজেই লাভ করা যায়।

৩.৫ কর্তৃত্ব (Authority)

Henry Fayol কর্তৃত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, তা এক ধরনের অধিকার যার দ্বারা হুকুম বা নির্দেশ দেওয়া যায় এবং অন্যরা তা পালন করে। এই কর্তৃত্ব থেকেই প্রশাসনিক ক্ষমতা আসে এবং কিছু নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য অবশ্যম্ভাবী হয়ে কর্তৃত্বের সঙ্গেই একত্রে জড়িত থাকে। কর্তৃত্ব প্রধানত কোনো নির্দিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের হাতেই ন্যস্ত থাকে যার সাহায্যে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন নির্দেশাবলির সাহায্যে অধস্তন কর্মচারীদের কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করেন। এই পারস্পরিক বোঝাপড়ার সম্পর্ককে নানাভাবে দেখা যায় যেমন—

● **গতানুগতিক প্রাচীনপন্থী কর্তৃত্ব (Traditional Authority)** ঃ প্রাচীনপন্থী কর্তৃত্বে কর্তা ও নেতার পারস্পরিক সম্পর্ক রাজা-প্রজার অথবা, প্রভু-ভৃত্যের মতো।

● **আইনি কর্তৃত্ব (Legal Authority)** ঃ এখানে আইনের ভিত্তিতে কর্তৃত্বের ক্ষমতা নির্ধারিত হয়। কোনো আইনের চোখে দোষী কোনো ব্যক্তির সাজা দেওয়ার ভার থাকে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের ওপর। যেমন—পুলিশ বা বিচারক ইত্যাদি।

● **আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের কর্তৃত্ব (Charismatic Authority)** ঃ অনেক সময় নেতার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ এতই প্রবল হয় যে অন্যরা সহজেই তার কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেয়।

● **গ্রহণীয়তার তত্ত্ব (Acceptance Theory) ঃ** Chester Barnard-এর মত অনুসারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কর্তৃত্বের কিছু কিছু জায়গা অন্যরা সহজেই মেনে নেয় যদিও তা সবসময় সর্বজনগ্রাহ্য নাও হতে পারে। সাধারণ যুক্তিগ্রাহ্য নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে কোনো বাধা না থাকলেও এক্ষেত্রে কিছু কিছু ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা পারস্পরিক বিশ্বাস ও নির্ভরতার জন্য অধস্তন কর্মচারীরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব মেনে নেয়।

● **দক্ষতার তত্ত্ব (Competency Theory) ঃ** পেশাদারি দক্ষতার ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির নিজস্ব কাজে দক্ষতা তার পেশাদারি কর্তৃত্বকে বজার রাখতে সাহায্য করে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রত্যেক পেশাদারি ব্যক্তি জানেন যে তাঁর কোনো কাজে অসুবিধা হলে তিনি অপেক্ষাকৃত দক্ষ কোনো মানুষের কাছে সাহায্য পেতে পারেন। অধিকাংশ সংস্থায় কোনো একটি বিশেষ ধরনের কর্তৃত্ব অপেক্ষা প্রায় সব কয়প্রকার কর্তৃত্বের সমন্বয় দেখা যায়। অবশ্য গতানুগতিক কর্তৃত্বের ধারণা এখন সম্পূর্ণই অচল।

৩.৬ ক্ষমতার প্রয়োগ ও কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ (Delegation of Authority and Decentralisation)

প্রশাসনিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করার জন্যে কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ অত্যন্ত জরুরি কারণ এর দ্বারা কিছু কিছু দায়িত্ব নির্দিষ্ট ব্যক্তির ওপরে অর্পণ করলে প্রধান দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসনের দৈনন্দিন কাজের চাপ কমে। এই বিকেন্দ্রীকরণ একদিকে যেমন গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার উপযোগী তেমনি ভবিষ্যতের নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জনের ক্ষেত্রে পরবর্তী ধাপের কর্মচারীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করে।

কোনো সর্বোচ্চ পদে আসীন প্রশাসক যদি দৈনন্দিন সংগঠন পরিচালনার দায়িত্বগুলি অন্যদের মধ্যে যথাযথভাবে বণ্টন করে দিয়ে তার উপযুক্ত তদারক করতে পারেন তাহলে তিনি নিজে প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যত উন্নতি ও বিকাশের ক্ষেত্রে আরও বেশি মনোনিবেশ করতে পারেন। কর্তৃত্বের বা ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতিটি কতগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল যা একে একে নীচে আলোচিত হল।

- কোনো নির্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব খুব স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়ে তবেই সেই ভাবে কারও হাতে দেওয়া উচিত।
- প্রত্যেকটি কাজের পরিধি, সুনির্দিষ্ট কর্তব্য ও দায়িত্ব এবং যথাযথ কার্যকারণ সম্পর্ক ও

দায়বদ্ধতার বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়া দরকার, যাতে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বুঝতে পারেন যে তাঁর কাজের গন্ডি কতটুকু এবং তাঁর প্রত্যক্ষ ঊর্ধ্বতন কর্তাকে।

- কোনো নির্দিষ্ট দায়িত্ব ঠিকভাবে বোঝানো না গেলে তা ক্ষতিকর হতে পারে। তাই নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের কর্মীদের কাছ থেকে উপযুক্ত প্রতি সংকেত নেওয়া উচিত যাতে কোনো অস্পষ্টতা থাকলেও তা সহজেই দূর হয়।

- ক্ষমতা ও দায়িত্ব বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে শুধু যে প্রশাসনের ওপরতলার বোঝা কমে তাই নয় এতে অধস্তন কর্মচারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ দেওয়ার ফলে তাদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ লক্ষ করা যায়।

- নেতৃত্বের গুণাবলি এবং উপযুক্ত দায়িত্ব নেওয়ার মানসিকতা তৈরির মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের কর্তৃত্ব নেওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিদের ক্রমশ তৈরি করে নেওয়া যায়।

- কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের আরও একটি উল্লেখযোগ্য সুবিধা হল এর ফলে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।

- এই বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার একটি বিশেষ অসুবিধার দিক হল এই যে অধস্তন কর্মীরা যদি সঠিকভাবে উৎসাহিত বোধ না করে তাহলে তাদের হাতে দায়িত্ব দিলে তা সবসময় মঙ্গালজনক নাও হতে পারে।

- Koonez এবং O'Donnel-এর মতে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত অধস্তন কর্মচারীরা অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা পায়, আত্মবিশ্বাসী হতে পারে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাহস লাভ করে এবং কোনো ভুল থেকেও সহজে শিক্ষা নিতে পারে।

- ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে এক্ষেত্রে অনেক বেশি ধৈর্যশীল হতে হয়। কারণ প্রাথমিকভাবে অপেক্ষাকৃত কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু কিছু প্রশাসনিক ভুল করতে পারে।

- নির্দিষ্ট সময়, নির্দিষ্ট লক্ষ্য ইত্যাদি বাস্তবসম্মত হলে কর্তৃত্বপ্রদান তথা বিকেন্দ্রীকরণের কাজটি অপেক্ষাকৃত বেশি সাফল্য লাভ করে।

- কোনো সংগঠনের আকার, গঠনগত জটিলতা, কর্মীদের দক্ষতা ও সৃজনশীলতা, স্পষ্টভাষায় মত বিনিময়ের ক্ষমতা ইত্যাদি এই প্রক্রিয়াকে সফল করতে সাহায্য করে, না হলে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ও প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

৩.৭ প্রতিষ্ঠানের স্বশাসন (Autonomy of Institutions)

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে উচ্চতর শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে যে বিপুল চাহিদার সৃষ্টি হয়েছে তার সঙ্গো তাল মিলিয়ে চলা সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পক্ষে ক্রমশ কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ঐতিহাসিক কারণে এবং ঐতিহ্যের কথা মাথায় রাখলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব অপরিসীম হওয়া সত্ত্বেও এই বিশাল প্রশাসনিক দায়ভার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে বহন করা ক্রমশ অত্যন্ত গুরুতর বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে বলেই রাজ্য সরকারি স্তরে যে কয়েকটি সমাধানসূত্র নিয়ে আলোচনা চলছে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হল,

- আঞ্চলিক দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিয়ে যাওয়া। যেমন, নদিয়া জেলার বেশ কিছু কলেজ যা আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল তা বর্তমানে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নেওয়া হয়েছে।
- উত্তর চব্বিশ পরগনার বেশ কিছু কলেজকে একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তার অধীনে নিয়ে যাওয়ার প্রশাসনিক চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে।
- কলকাতায় অবস্থিত কিছু বেসরকারি মালিকানার সুপরিচিত কলেজকে সরাসরি প্রশাসনিক স্বশাসনের আওতায় আনার কথা বিবেচনা করা হচ্ছে। যার মধ্যে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ইতিমধ্যেই স্বশাসন ব্যবস্থার পরীক্ষামূলক প্রয়োগ শুরু করেছে। আগামী ছয় বৎসর এই স্বশাসন ব্যবস্থার সাফল্য ও ব্যর্থতার মূল্যায়ন করলে এই নতুন মডেলটির যৌক্তিকতা আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট হবে।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনপ্রাপ্ত বেশ কিছু কলেজ যারা বিভিন্ন বিষয়ে ইতিমধ্যেই স্নাতকোত্তর পঠনপাঠনের ব্যবস্থা চালু করেছে তাদের ওই স্নাতকোত্তর বিভাগগুলিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পঠনপাঠন ও পরীক্ষার ক্ষেত্রে স্বশাসন দিয়েছে। এই ধরনের স্বশাসন ব্যবস্থার মূল কথা হল—
- তারা নিজস্ব অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল এবং বোর্ড অফ স্টাডিজ গঠন করতে পারে এবং উপযুক্ত বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ও সক্রিয় সহযোগিতায় তারা নিজস্ব পাঠ্যসূচি, পঠনপাঠন পদ্ধতি, অতিথি অধ্যাপক নিয়োগ, পরীক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদির দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। যদিও এই

ধরনের স্বশাসন ব্যবস্থাকে শিক্ষাগত স্বশাসন (academic autonomy) বলা হচ্ছে কারণ অর্থনৈতিকভাবে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের মতো কোনো প্রতিষ্ঠান বা অন্য যে-কোনো কলেজের স্নাতকোত্তর স্বশাসিত বিভাগগুলি বিশ্ববিদ্যালয় তথা রাজ্য সরকারের ওপর নির্ভরশীল।

- কলকাতার অন্যতম প্রধান ঐতিহ্যমণ্ডিত কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজকে স্বশাসন দেওয়ার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ স্বশাসনের বিপক্ষে যাওয়ায় রাজ্য সরকার এ বিষয়ে এখনও কোনো প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি।
- বেশ কিছু সরকারি কলেজকে একত্রে একটি Autonomous College Cluster (স্বশাসিত মহাবিদ্যালয়গুচ্ছ) রূপে স্বশাসন দেওয়ার বিষয়টি সরকারের প্রশাসনিক স্তরে চিন্তাভাবনার অন্যতম প্রধান বিষয় হলেও এখনও এ বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি।

৩.৭.১ স্বপরিচালিত সংস্থা (Self Management Institution)

স্বপরিচালিত সংস্থা বলতে মূলত সেইসব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকেই বোঝায় যারা প্রশাসনিক বা অর্থনৈতিক দিক থেকে রাজ্য সরকারের ওপর নির্ভরশীল না হলেও পাঠ্যসূচির এবং পরীক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কোনো না কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে এবং তাদের অধীনেই পঠনপাঠন ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা পরিচালনা করে। এইসব প্রতিষ্ঠানে ভরতির ক্ষেত্রে আলাদা পরিচালক সংস্থার আয়ত্তাধীন আসন সংখ্যা সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ অনুসারে পঞ্চাশ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে এবং তার সাহায্যে এইসব প্রতিষ্ঠানগুলি 'ক্যাপিটেশন ফি', অর্থাৎ ভরতির জন্য এককালীন দেয় বিপুল পরিমাণ অর্থ আদায় করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করে থাকে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন দুর্নীতির সম্ভাবনাকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এক্ষেত্রে যোগ্যতা অপেক্ষাও আর্থিক সক্ষমতাই প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

- কোনো কোনো কেন্দ্রীয় সংস্থা যেমন, ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে All India Council of Technical Education (A.I.C.T.E.) ; Medical শিক্ষায় Medical Council of India (M.C.I.) এবং শিক্ষক শিক্ষণে National Council of Teacher Education (N.C.T.E.) ইত্যাদি সরাসরি বাধ্যতামূলকভাবে সমস্ত কলেজের অনুমোদন দেওয়া শুরু করার পর থেকে সারা দেশ জুড়ে বেসরকারি পুঁজি এইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং উন্নততর পরিকাঠামো ও পরিসেবার আকর্ষণে বহু শিক্ষার্থী অপেক্ষাকৃত উচ্চহারে অর্থ ব্যয় করেও এইসব বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দারস্থ হচ্ছে।

- কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের নিয়মকানুন খুব সামান্যই পালন করে এইসব স্বশাসিত এবং স্বনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি তাদের প্রশাসনিক বা শিক্ষাগত কর্মকাণ্ড চালায় যেখানে প্রতিনিধি হিসাবে সরকারি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত থাকেন ঠিকই কিন্তু প্রশাসনিক কোনো সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সরকারি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধির ভূমিকা খুবই নগণ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর বিপুল বোঝা কমানোর জন্য স্বশাসন ব্যবস্থা আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন পরীক্ষামূলক ব্যবস্থার দিশা দিয়েছে।

৩.৮ সাংগঠনিক কাঠামো (Organisational Structure)

সাংগঠনিক কাঠামো কথাটির অর্থ কোনো সংস্থায় কর্মরত ব্যক্তিদের পারস্পরিক অবস্থান, দায়িত্ব ও ক্ষমতার তারতম্য অনুযায়ী পারস্পরিক সম্পর্ক। বহুদিন ধরেই সমাজবিজ্ঞানী এবং ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞরা সাংগঠনিক কাঠামোর বিভিন্ন ধরন নিয়ে বহু গবেষণা করেছেন এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। Henry Fayol, Fredrick Taylor, Lyndall Urwick প্রমুখ প্রাচীনপন্থীরা যে Classical design-এর তত্ত্ব উল্লেখ করেছিলেন তাতে পিরামিডের মতো আকৃতির এক hierarchical system দেখা যায় যেখানে কর্তৃত্ব বা নেতৃত্বের ক্ষমতা ক্রমশ সিঁড়ির ধাপের মতো ঊর্ধ্বতন থেকে অধস্তন কর্মীদের দিকে ধাপে ধাপে নেমে আসে। এই জাতীয় কাঠামোর প্রধান বৈশিষ্ট্য, ক্ষমতা ও দায়িত্ব ক্রমশ উচ্চতর অধিকারিকের হাতে কেন্দ্রীভূত হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত ক্ষমতা সর্বোচ্চ পদাধিকারীর হাতে ন্যস্ত হয়। এর ফলে অধস্তন কর্মীরা কর্তব্য পালন করলেও সবসময় পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে না।

এই ধরনের সিঁড়ির ধাপের মতো সাংগঠনিক কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার যে কাঠামো তার বিরোধিতা করেন কিছু আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী। যেমন, Elton Mayo, Mary Parker Follet, Chester Barnard, Douglas Mcgregor প্রমুখ। এঁরা মনে করেন সিঁড়ির ধাপের মতো ক্রমোচ্চ পদ্ধতির তুলনায় অনেক বেশি কার্যকরী কাঠামো হতে পারে প্রত্যক্ষভিত্তিক (Organic Structure)। যেখানে বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব অনুসারে পারস্পরিক সমান্তরাল কর্তৃত্বের কিছু পদ সৃষ্টি করা যায় (যেমন, শরীর সংস্থানে এক একটি প্রত্যঙ্গ নিজের নিজের কাজ সম্পন্ন করে) এবং মূল সংগঠনকে কিছু নির্দিষ্ট বিভাগে

(department) বিভক্ত করে তাদের আলাদা নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করা যায়। শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্রে এই মডেলের সবচেয়ে পরিচিত উদাহরণ হল,—

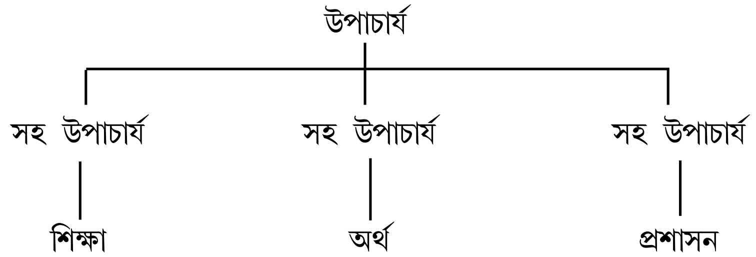

অথবা

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

এই তত্ত্বের জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা যে-কোনো গণতান্ত্রিক, প্রশাসনিক ব্যবস্থায় অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি। যার ফলে, একদিকে যেমন নেতৃত্বের চাপও কমে আবার অন্যদিকে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে আরও বেশি সংখ্যক ব্যক্তিকে প্রশাসনিক কাঠামোর অধীনে আনা যায়। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, ক্রমোচ্চ পর্যায় পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে বেশি প্রথাবদ্ধ বা গতানুগতিক কাঠামো এবং প্রত্যঙ্গাভিত্তিক কাঠামো, যার উদাহরণ পরে দেওয়া হয়েছে, তা অপেক্ষাকৃত প্রথামুক্ত এবং আধুনিক। এই কাঠামোর সাহায্যে কর্মীদের দলবদ্ধভাবে কাজের উৎসাহ ও ক্ষমতা বাড়ে, পারস্পরিকভাবের আদানপ্রদানের উন্নতি ঘটে, দলগত দায়িত্বপালন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতাও বৃদ্ধি পায়। শিল্পক্ষেত্রেও দেখা যায় কোনো বড়ো সংস্থা তাদের প্রশাসন অপেক্ষাকৃত সহজে চালানোর জন্য বিভিন্ন ভাইসপ্রেসিডেন্ট পদ সৃষ্টি করে এবং প্রত্যেকের অধীনে একটি করে আলাদা বিভাগ তৈরি করে দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিকে বিভাগীকরণ বা departmentation বলা হয়। যার কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। যে-কোনো সংস্থার কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য এই বিভাগীকরণ বা বিকেন্দ্রীকরণ নীতি নতুন সাংগঠনিক কাঠামো সৃষ্টি করেছে যা প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক বেশি আধুনিক।

Departmentation বা বিভাগীকরণ পদ্ধতির বিভিন্ন প্রকারভেদ অনুসারে সাংগঠনিক কাঠামোর রকমফের হতে পারে। যেমন,—

● **কাজ অনুসারে বিভাগীকরণ** (Departmentation by Function)

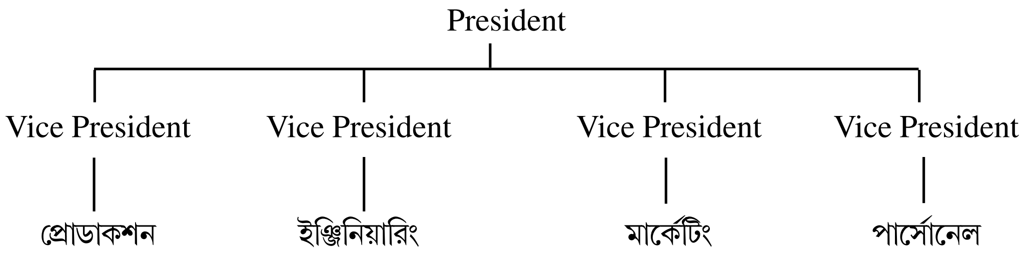

শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্রে এর উদাহরণ আগেই দেওয়া হয়েছে।

● **উৎপাদিত বস্তু অনুসারে বিভাগীকরণ** (Departmentation by Product)

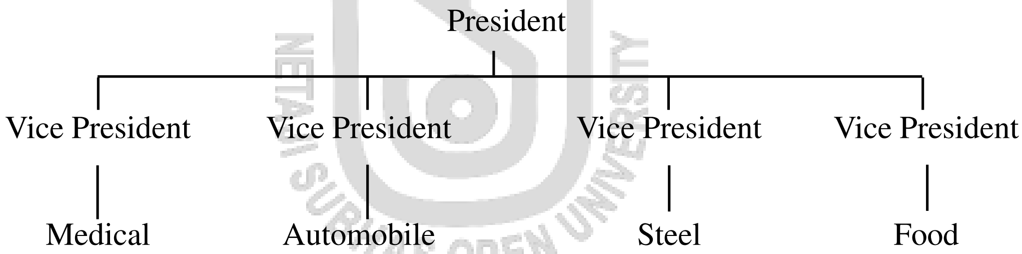

যে সংস্থা বহুমুখী উৎপাদনে নিয়োজিত তার ক্ষেত্রে এই ধরনের বিভাগীকরণ প্রচলিত। শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক সংস্থা একই সঙ্গে সাধারণ শিক্ষা (General Course), পেশাদারি শিক্ষা (Professional Course) ইত্যাদি পরিচালনা করে। তাদের ক্ষেত্রে এই বিভাগীকরণ প্রযোজ্য।

● **কাজের ক্ষেত্র অনুসারে বিভাগীকরণ** (Departmentation by Area)

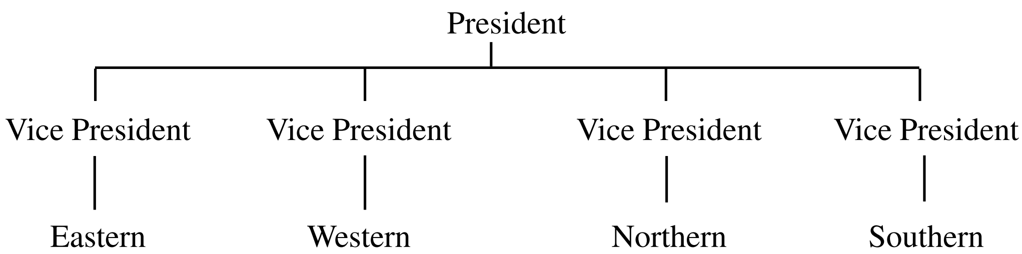

শিক্ষার ক্ষেত্রে এই জাতীয় আঞ্চলিক বিভাগীকরণের উদাহরণ, NCTE-র দিল্লিতে অবস্থিত কেন্দ্রীয় NCTE-তে আছেন সভাপতি (Chairman) এবং চারজন আঞ্চলিক নির্দেশক (Regional

Director)। এরা প্রত্যেকেই কেন্দ্রীয় NCTE-তে গৃহীত নীতি অনুযায়ী স্বাধীনভাবে অনেক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

● **সময় অনুসারে বিভাগীয়করণ** (Departmentation by Time)

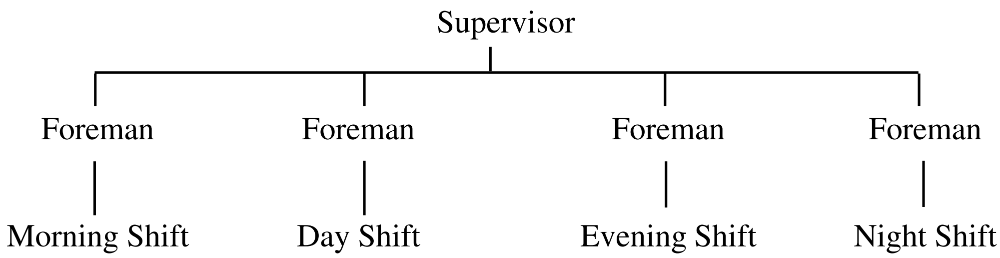

অতীতে অনেক বড়ো বড়ো কলেজে এই জাতীয় ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। প্রাতঃবিভাগ, দিবাবিভাগ, সান্ধ্যবিভাগ ইত্যাদির জন্য আলাদা অধ্যক্ষ বা সহ অধ্যক্ষ নিয়োগ করা হত। বর্তমানে প্রতিটি বিভাগের আলাদা নাম দেওয়া হলেও প্রশাসনিক কর্তৃত্ব প্রায়ই একটি কেন্দ্রীয় সংস্থার (Trust, Society বা অন্যকিছু) হাতে ন্যস্ত।

● বিশেষ কাজ অনুযায়ী দায়িত্ব বণ্টন করার মাধ্যমে বিশেষ সাংগঠনিক কাঠামো সৃষ্টি। যেমন, কোনো বিশেষ task force, commission বা committee ইত্যাদি গঠনের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রদান করা এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের সুপারিশ গ্রহণ ও কার্যকর করা। কখনও ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষ Project Group সৃষ্টি করা হয় এবং নির্দিষ্ট কোনো দক্ষ ব্যক্তির হাতে Project Manager-এর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিও বহুল প্রচলিত।

প্রশাসনিক বা সাংগঠনিক কাঠামোর অন্য আর এক ধরনের উদাহরণ হল রৈখিক সংগঠন (Line Organisation)। যেখানে একজন President বা প্রশাসনিক সর্বোচ্চ কর্তার অধীনে একাধিক Vice President থাকেন এবং তাঁদের প্রত্যেকের অধীনে একাধিক General Manager থাকেন। আবার প্রত্যেক General Manager-এর অধীনে একাধিক Works Manager থাকেন। প্রত্যেক Works Manager-এর অধীনে একাধিক Supervisor, আবার প্রত্যেক Supervisor-এর অধীনে একাধিক Foreman এবং প্রত্যেক Foreman-এর অধীনে একাধিক Assistant Foreman থাকেন এবং সবশেষে সাধারণ কর্মীরা থাকেন। এভাবে Line and Staff Orgaisational Structure গঠিত হয়।

ম্যানেজমেন্ট বিষয়টির বিভিন্ন তত্ত্ব প্রধানত শিল্পক্ষেত্রে বেশি ব্যবহৃত হলেও শিক্ষা প্রশাসনের

ক্ষেত্রে তার বহু সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় বলে শিক্ষার প্রশাসনিক কাঠামোতে এই তত্ত্বগুলির বহুল প্রচলন দেখা যায়। যেমন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রৈখিক সংগঠনের উদাহরণ বিশ্ববিদ্যালয়।

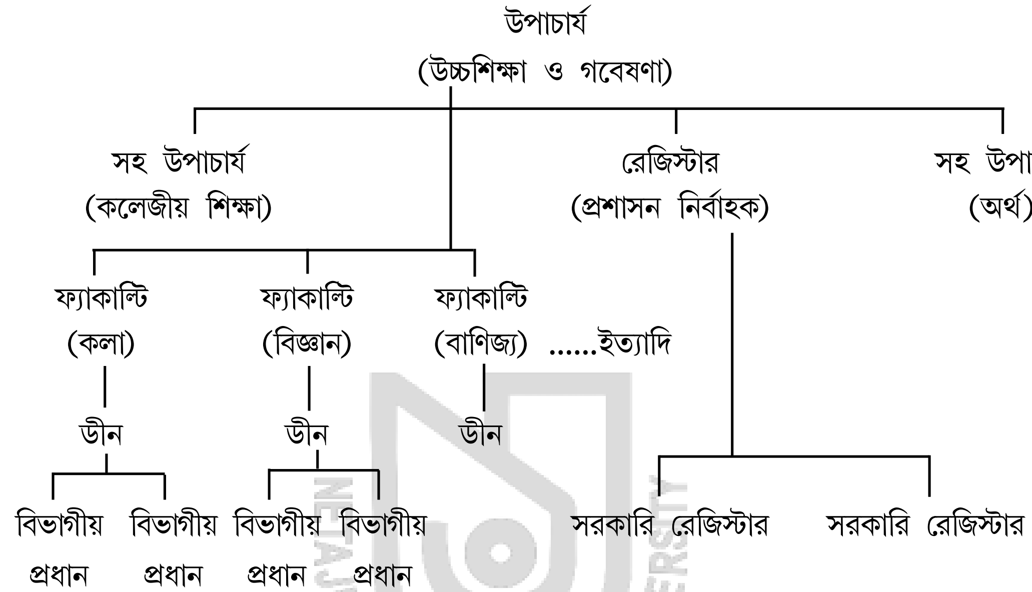

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

উপরিউক্ত উদাহরণটি একটি ছক বা উদাহরণ মাত্র। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই নীতিই অনুসৃত হয়। প্রকৃত সাংগঠনিক কাঠামো আরও কিছুটা জটিল।

৩.৯ সারসংক্ষেপ (Summary)

শিক্ষা ও অন্যান্য সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় কোনো না কোনো সংস্থার মাধ্যমে। যখন কিছু সংখ্যক ব্যক্তি একত্রে একটি সংগঠিত প্রতিষ্ঠানে একত্রিত হয়ে নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার মাধ্যমে কোনো সাধারণ লক্ষ্য অভিমুখে কাজ করে চলে তখন তাকে বলা হয় সংস্থা। সংস্থা ছাড়া মানুষের সামাজিক ও অন্যান্য কাজ অচল। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সংস্থাকে ব্যক্তির সমন্বয় হিসাবে গণ্য করা হয় আর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী কর্মীদের দায়িত্ব, দক্ষতা ও প্রচেষ্টার মিলিত রূপই সংস্থার প্রাণকেন্দ্র। সংস্থা সক্রিয় থাকে কয়েকটি নীতির ভিত্তিতে। প্রধান নীতিগুলি হল, উদ্দেশ্যের নীতি, সংহতির নীতি, সম্পর্কের নীতি, বোঝাপড়ার নীতি, বিকেন্দ্রীকরণের নীতি, ব্যক্তিগত ভূমিকার নীতি, দায়িত্ব বন্টন নীতি, কর্মী নির্বাচন নীতি ও নেতৃত্বের নীতি।

নানা সুবিধার জন্য বৃহৎ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়। কর্মী নির্বাচনের জন্য সাধারণত তিনপ্রকার কর্মীর প্রয়োজন হয়, অদক্ষ কর্মী, অল্প দক্ষকর্মী এবং দক্ষকর্মী। একজন দক্ষকর্মীর অধীনে কয়েকজন অল্প দক্ষকর্মী। আবার প্রত্যেক অল্প দক্ষকর্মীর অধীনে কয়েকজন অদক্ষ কর্মী নিয়োগ করার ফলে কোনো সংস্থার কর্মীদের দক্ষতা ও সংখ্যার ভিত্তিতে পিরামিডাকৃতি গঠন দেখা যায়।

সংস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য দরকার কর্তৃত্বের বণ্টন। প্রশাসন বিশেষজ্ঞরা নানা ধরনের কর্তৃত্বের কথা বলেছেন। যেমন, গতানুগতিক প্রাচীনপন্থী কর্তৃত্ব, আইনি কর্তৃত্ব, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের কর্তৃত্ব, গ্রহণীয় নেতৃত্ব এবং দক্ষতাভিত্তিক নেতৃত্ব। অধিকাংশ সংস্থা মিশ্র প্রকৃতির কর্তৃত্বের দেখা পাওয়া যায়। কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার বণ্টনের ভিত্তিতে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার পরিবর্তে বিকেন্দ্রীকরণের ধারণা তৈরি হয়েছে। বিকেন্দ্রীকরণের ফলে প্রধান সংস্থা বা নেতৃত্বের ওপর চাপ কমে, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। কর্মীদের দায়িত্ববোধ, উৎসাহ ও দক্ষতা বাড়ানো যায় এবং পরবর্তী পর্যায়ের নেতৃত্বের ধারা তৈরি হয়ে ওঠে। কিন্তু বিকেন্দ্রীকরণ যথাযথ না হলে, দায়িত্ব কর্তব্য স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট না হলে এবং মতবিনিময় ও যোগাযোগের সুবিধা না থাকলে কেন্দ্রীকরণের ফলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে।

বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার একটি নীতি হল, প্রতিষ্ঠানের স্বশাসন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর্থিকভাবে সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর নির্ভরশীল তাদের শিক্ষাগত স্বশাসন দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্প্রতি দেওয়া শুরু হয়েছে। আবার যেসব সংস্থা আর্থিকভাবে স্বনির্ভর তারা নিজস্ব পরিচালনা ব্যবস্থার মাধ্যমে কাজ করলেও শিক্ষাগতভাবে অর্থাৎ পাঠক্রম ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অধীনে থাকে। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা (Central Regulatory Bodies) যেমন, A.I.C.T.E., M.C.I., N.C.T.E. ইত্যাদি, সরাসরি অনুমোদন দেওয়ার নিয়ম বাধ্যতামূলক করার ফলে, দ্বিতীয়প্রকার স্বশাসিত সংস্থার সংখ্যা সম্প্রতি বৃদ্ধি পেয়েছে—বিশেষত পেশাদারি শিক্ষার ক্ষেত্রে।

সাংগঠনিক কাঠামো কথাটির অর্থ সংস্থায় কর্মরত ব্যক্তিদের পরস্পর অবস্থান বা সম্পর্ক। এই জন্য বৃহৎ সংস্থায় প্রয়োজন হয় বিভাগীকরণের। বিভাগীকরণের অনেকগুলি নীতি অনুসৃত হয়। কাজ অনুযায়ী বিভাগ, উৎপাদনভিত্তিক বিভাগ, কাজের ক্ষেত্র অনুযায়ী আঞ্চলিক বিভাগ, সময় অনুযায়ী বিভাগ ইত্যাদি ছাড়াও রৈখিক কাঠামো বৃহৎ সংস্থায় বহুল প্রচলিত। তাত্ত্বিক দিক থেকে ক্রমোচ্চপর্যায়ের পিরামিডাকৃতি গঠন অপেক্ষা বর্তমানে উপরিউক্ত প্রত্যঙ্গভিত্তিক কাঠামো বেশি প্রচলিত।

শিক্ষাসংস্থা ক্ষেত্রেও প্রায় সমস্ত রকমের কাঠামো ও বিভাগীকরণ প্রচলিত আছে।

৩.১০ প্রশ্নাবলি (Questions)

১। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) সংস্থা কাকে বলে?

(খ) সংস্থায় সংহতির নীতি কী?

(গ) বিকেন্দ্রীকরণ নীতির মূল কথাটি বিবৃত করুন।

(ঘ) বিভাগীকরণ কাকে বলে?

(ঙ) কর্তৃত্ব কথাটির অর্থ কী?

(চ) শিক্ষায় দুটি স্বপরিচালিত সংস্থার নাম লিখুন ও তাদের কাজ উল্লেখ করুন।

২। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) সংস্থার নীতি বলতে কী বোঝায়? নীতিগুলির নাম লিখুন।

(খ) দক্ষতা অনুযায়ী কর্মীদের দায়িত্বভাগ কীভাবে সম্পন্ন হয়?

(গ) কর্তৃত্বের কত রকমফের হতে পারে? কর্তৃত্বের গ্রহণীয়তার তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) প্রতিষ্ঠানের স্বশাসনের সুফল কী?

(ঙ) সাংগঠনিক কাঠামো কাকে বলে?

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) সংস্থা কাকে বলে? সংস্থার নীতিগুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিন।

(খ) কর্তৃত্ব কাকে বলে? কর্তৃত্ব কতপ্রকার? কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ কেন প্রয়োজন হয়? বিকেন্দ্রীকরণের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা করুন।

(গ) কোনো প্রতিষ্ঠানের স্বশাসনের পিছনে যুক্তিগুলি কী কী? এর সুবিধা-অসুবিধা উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

(ঘ) সাংগঠনিক কাঠামো কাকে বলে? বিভিন্ন ধরনের সাংগঠনিক কাঠামো সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করুন।

একক ৪ ❑ শিক্ষায় আর্থিক প্রসঙ্গ (Educational Finance)

গঠন (Structure)

৪.১ প্রস্তাবনা

৪.২ উদ্দেশ্য

৪.৩ শিক্ষায় অর্থ বরাদ্দের সূত্রপাত

৪.৪ আর্থিক অনুদান

৪.৫ অনুদানের প্রকারভেদ

৪.৫.১ আনুপাতিক অনুদান ব্যবস্থা

৪.৫.২ শ্রেণিভিত্তিক অনুদান

৪.৫.৩ ক্ষতিপূরণ অনুদান

৪.৫.৪ বহুবিধ অনুদান

৪.৬ আর্থিক অনুদানের উৎস

৪.৭ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেসরকারিকরণ

৪.৭.১ সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠান

৪.৮ সারসংক্ষেপ

৪.৯ প্রশ্নাবলি

৪.১ প্রস্তাবনা (Introduction)

যে-কোনো দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হয় বিপুল পরিমাণ অর্থের। শিক্ষা প্রশাসনের অন্যতম বিষয় অর্থের সংস্থান ও সদ্ব্যয় করার প্রক্রিয়া। প্রাচীনকাল থেকেই শিক্ষা সামাজিক কর্তব্য হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। সেজন্য বিদ্বান ব্যক্তির ভরণ-পোষণ ও শিক্ষাদানে নিয়োজিত বিদ্বজ্জনের সমস্ত ব্যয়ভারও রাজারা বহন করে নিজেদের ধন্য মনে করতেন। এমনকি শিক্ষার্থীর ভরণ-পোষণও পরোক্ষভাবে রাজারাই বহন করতেন। কারণ প্রাচীন ভারতেও গুরুগৃহে থেকে শিষ্যরা যখন শিক্ষালাভ করত তখন ভূমি, গোধন ইত্যাদি এবং ক্ষেত্র বিশেষে অন্যান্য উপকরণও নিয়মিত দান

করতেন রাজারাই। সাধারণ মানুষের অবদান বলতে ব্রহ্মচর্যকালে ভিক্ষাপ্রার্থী শিষ্যদের দেওয়া ভিক্ষাই একমাত্র উল্লেখ করতে হয়।

মধ্যযুগে ইসলামিক শিক্ষা নবাবি পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা ভারতীয় শিক্ষার জন্যও বজায় ছিল। আকবরের মতো উদার সম্রাটরা সমস্তরকম শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন শুরু হওয়ার সঙ্গো সঙ্গো ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতার প্রসঙ্গাটি ক্রমশ গৌণ হতে শুরু করে এবং শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারি অনুদান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এ ছাড়াও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গো সঙ্গো শিক্ষার প্রসার অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। শিক্ষকতা বেতনভুক বৃত্তি হিসাবে গৃহীত হয় সমাজে। সুতরাং শিক্ষা ক্রমশ ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে। ছাত্রবেতন প্রথা চালু হলেও তাতে ব্যয়ের সামান্য অংশই পূরণ হয়। শিক্ষা বিস্তারের আর একটি দিক হল উল্লম্ব প্রসার, অর্থাৎ প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত শিক্ষার প্রসার। এর জন্য বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজন, বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন এবং উন্নততর উপকরণ প্রয়োজন। এইসব কিছু শিক্ষার ব্যয়ের ঊর্ধ্বগতি নির্দেশ করে।

বর্তমান এককটিতে শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করার জন্য যে আর্থিক সংস্থান দরকার তার জোগান ও উৎস সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। সেই সঙ্গো সরকারি ও বেসরকারি উৎসের প্রসঙ্গোও আলোচনা করা হয়েছে। শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক প্রসঙ্গাটি শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তুলে ধরা হয়েছে। প্রকৃত ব্যয়বরাদ্দ ও বণ্টন প্রক্রিয়া শিক্ষার অর্থনীতি (Economics of Education) নামক একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে আলোচিত হয়।

৪.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- শিক্ষায় অর্থ বরাদ্দের সূত্রপাত কীভাবে হল তা সংক্ষেপে বলতে পারবেন।
- অনুদান কাকে বলে এবং অনুদানের প্রকারভেদ করতে পারবেন।
- আর্থিক অনুদানের উৎস সম্বন্ধে বিবরণ দিতে পারবেন।
- শিক্ষার বেসরকারিকরণের প্রসঙ্গাটি আলোচনা করতে পারবেন।

৪.৩ শিক্ষায় অর্থ বরাদ্দের সূত্রপাত (Beginning of Educational Grants)

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, শিক্ষাক্ষেত্রে বরাবরই রাজা, জমিদার বা ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা বজায় ছিল। প্রাচীনকাল থেকে মধ্যযুগের শিক্ষাব্যবস্থা পর্যন্ত আমরা এই ধরনের ব্যক্তিগত উদ্যোগ বা ব্যক্তিমালিকানার প্রভাব দেখতে পাই। এরপর ক্রমশ সরকারি উদ্যোগে আর্থিক অনুদান আসতে শুরু করে। যদিও তা প্রথমদিকে যথেষ্ট অনিয়মিত ছিল। শিক্ষা জগতের ইতিহাস ঘাঁটলে আমরা দেখতে পাই ব্রিটিশ আমলে উডের প্রতিবেদনই (Wood's Despatch) সর্বপ্রথম শিক্ষাখাতে নির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ করার কথা উল্লেখ করে। এর পূর্বে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টার আইনে (Charter Act, 1813) ভারতবর্ষে শিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকা ব্যয় করার কথা বলা হয়। কিন্তু ওই টাকা ভারতীয় শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে না, ইংরাজি শিক্ষা প্রচলনের জন্য ব্যয় করা হবে তাই নিয়ে ভারতীয়দের মধ্যে প্রবল বিতর্ক উপস্থিত হয়। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে লর্ড বেন্টিঙ্কের আমন্ত্রণে ভারতে এসে মেকলে ইংরাজি শিক্ষার স্বপক্ষে রায় দিলে এই বিতর্কের অবসান ঘটে। কিন্তু এই বরাদ্দকে প্রকৃত অর্থে আর্থিক অনুদান বলা চলে না। অন্যান্য যে-কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল পার্থক্য হল এই যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্থ লগ্নির মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন নয়। মূল উদ্দেশ্য হল দেশের মানবসম্পদের সার্বিক উন্নয়ন।

স্বাধীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় আর্থিক অনুদানের বিষয়টি মূলত সরকারি হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, অধিকাংশ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই প্রধানত মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে তাদের প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে। ভারতবর্ষের মতো বিপুল জনসংখ্যার দেশে শিক্ষাখাতে সরকারি অনুদানের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয় বলেই ধীরে ধীরে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমাদের সমাজে দুই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমান্তরাল বৃদ্ধি ও চাহিদা আমরা লক্ষ করে যাচ্ছি। শিক্ষার মূল লক্ষ্য যদি হয় দেশের সমস্ত মানবসম্পদের পরিপূর্ণ বিকাশ ও উন্নয়ন তাহলে রাষ্ট্রকে শিক্ষাখাতে এক বিশাল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয় যা বাস্তবে সম্ভব না হওয়ার ফলে বেসরকারি পুঁজির প্রবেশ একান্তই অসম্ভব।

৪.৪ আর্থিক অনুদান (Financial Grants)

যখন রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষার ব্যয়নির্বাহ করার জন্য কোনো সংস্থাকে নিয়মিত নির্দিষ্ট

পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করে, তখন তাকে বলা হয় অনুদান (Grant)। আর্থিক অনুদান বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। যেমন ঃ—

- সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান।
- স্থানীয় আধা সরকারি কর্তৃপক্ষ পরিচালিত প্রতিষ্ঠান।
- বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠান।
- কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে স্থাপিত নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী বা ট্রাস্টি বোর্ড পরিচালিত প্রতিষ্ঠান।
- কিছু বেসরকারি সংস্থা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান।
- ব্যক্তি মালিকানার প্রতিষ্ঠান যে-কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির অর্থে পরিচালিত হয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিক অনুদান পাওয়ার জন্যে কিছু পরিচালন সংক্রান্ত শর্ত মেনে চলতে হয় এবং উৎকর্ষের নির্দিষ্ট মান বজায় রাখতে হয়। বিধিসম্মত ব্যয়সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠানগুলির অনুদানের মাত্রা নির্ধারিত হয়। যার মধ্যে পড়ে—

- কর্মচারীদের বেতন।
- গৃহ সংরক্ষণজনিত খরচ বা গৃহনির্মাণ বাবদ খরচ।
- বাড়ি ভাড়া বা ট্যাক্স।
- আসবাবপত্র, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, পুস্তকাদি ইত্যাদির খরচ।
- দৈনন্দিন প্রয়োজনভিত্তিক খরচ (contingency grant)।

৪.৫ অনুদানের প্রকারভেদ (Types of Grants)

এইসব বিধিবদ্ধ ব্যয় সাধারণত সরকারি ক্ষেত্রে চার প্রকারের অনুদান পদ্ধতি থেকেই বহন করতে হয়—

৪.৫.১ আনুপাতিক অনুদান ব্যবস্থা (Matching Grant System)

এই ব্যবস্থায় যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের মোট খরচের একটা অংশ সরকারি সূত্র থেকে পাওয়া গেলেও বাকি অংশ প্রতিষ্ঠানকে নিজেদেরই জোগাড় করে নিতে হয়। আনুপাতিক অনুদানের ক্ষেত্রে উভয়পক্ষকেই সমান সমান ব্যয়ভার বহন করতে হয়।

৪.৫.২ শ্রেণিভিত্তিক অনুদান (Classwise Grant)

এই পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয় এবং তাদের মান অনুসারে আর্থিক অনুদানের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী দেখা যায় যে এরফলে স্বচ্ছল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমশ আরও উন্নত বা স্বচ্ছল হয়ে ওঠে। অথচ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও অনুন্নত প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে বলে তারা প্রতিযোগিতার বাজারে ক্রমশই পিছিয়ে পড়ে। এই সমস্যার কথা মাথায় রাখলে আধুনিক শিক্ষা প্রশাসকদের এই নীতি বর্জন করা উচিত বরং দুর্বল ও অনুন্নত শ্রেণির বিদ্যালয়গুলিকে উন্নত করার উপযোগী অনুদান মঞ্জুর করা উচিত।

৪.৫.৩ ক্ষতিপূরণ অনুদান (Deficit Grant)

কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত আয় ও ব্যয়ের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায় এবং যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বাজেট অনুসারে সংকুলান করা সম্ভব হয় না, সেই পরিমাণ অর্থ সরকারি সূত্র থেকে পাওয়ার ব্যবস্থাকে ক্ষতিপূরণ অনুদান বলা হয়। যদিও বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় এই অনুদানের আনুপাতিক হার ক্রমশই কমের দিকে যেতে যেতে শেষে প্রায় শূন্যে ঠেকেছে। এই অবস্থায় দুর্বলতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অস্তিত্ব বহুক্ষেত্রেই সংকটাপন্ন।

৪.৫.৪ বহুবিধ অনুদান (Miscellaneous Grant)

কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নির্দিষ্ট অর্থের অনুদানকে এই খাতে ফেলা হয়। এই ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান একটি প্রকার হল এককালীন (Capital Grant) যা গৃহনির্মাণ, আসবাবপত্র ক্রয়, কম্পিউটার বা ল্যাবরেটরি সরঞ্জাম ক্রয় বা লাইব্রেরির বই কেনার জন্য দেওয়া হয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (UGC) বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে এই খাতে অর্থ বরাদ্দ করে যা শিক্ষকদের গবেষণা কাজের ছোটো প্রয়োজন মেটানোর জন্য ব্যয় হয়।

৪.৬ আর্থিক অনুদানের উৎস (Source of Financial Grant)

যে-কোনো দেশে আর্থিক অনুদান নির্ভর করে শিক্ষাখাতে গৃহীত কিছু নীতির ওপর ভিত্তি করে। যথা,

- রাষ্ট্রের শিক্ষানীতি এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প।

● জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার চাহিদা।

● জনসংখ্যার সমষ্টি ও গড় বৃদ্ধির হার।

● সমাজে শিক্ষার গুরুত্ব।

● দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান।

● শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের জোগান এবং সেই অনুসারে শিক্ষার বিভিন্ন খাতে অর্থ বরাদ্দের নীতি।

আমাদের দেশ ভারতে প্রজাতান্ত্রিক নীতি গৃহীত হয় এবং ১৯৫০ সালে সংবিধান নির্দেশিত পথে শিক্ষানীতি নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে ভারত সার্বিকভাবে মানবসম্পদ উন্নয়নকে মূলনীতি হিসাবে সামনে রেখে শিক্ষাখাতে ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারিত করে। শিক্ষা বিষয়টির মধ্যে বিভিন্ন উপক্ষেত্র অনুসারে এই ব্যয়বরাদ্দ করা হয় যেমন, প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, প্রযুক্তিগত শিক্ষা এবং বৃত্তিগত শিক্ষা। সুতরাং রাষ্ট্রের শিক্ষা বাজেটে শিক্ষার কোন্ খাতে কতটা অর্থব্যয় করলে শিক্ষার উন্নয়নে ভারসাম্য রাখা যাবে তা একটি নীতিগত বিষয় হিসাবে শিক্ষানীতিতে উল্লেখ করা থাকে। যেমন, দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ছয় থেকে চোদ্দো বছর বয়সি সকল শিশুকে শিক্ষার আওতায় আনার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যা সর্বশিক্ষা অভিযান নামে পরিচিত।

আর্থিক অনুদানের উৎস হিসাবে মূলত আমরা কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, জেলা পর্ষদ বা municipality, ধর্মীয় সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা বা ব্যক্তিগত দান ও trustee board-এর অনুদানকেই বুঝে থাকি। তুলনামূলকভাবে পর্যালোচনা করলে অন্যান্য আর্থিক অনুদানের উৎসের তুলনায় কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের ভূমিকা অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক প্রসারিত। ১৯৬৪ সালে কোঠারি কমিশন আর্থিক অনুদানের বিষয় কিছু নির্দিষ্ট সুপারিশ করেছিলেন—

● ১৯৬৫-৬৬ সালে জন প্রতি শিক্ষাখাতে ব্যয় ছিল ১২ টাকা এবং ২০ বছর পর অর্থাৎ ১৯৮৫-৮৬ সালে দ্রব্যমূল্য অপরিবর্তিত থাকলে জন প্রতি ব্যয় করা উচিত ৫৪ টাকা। ১৯৬৫-৬৬ সালে মোট জাতীয় উৎপাদনের (GNP) মাত্র ২·৯% ব্যয় করা হয়েছিল বলে কমিশন সুপারিশ করেছিল যে তা বাড়িয়ে ৬% করা উচিত। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে চল্লিশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে অনুদান তার চেয়ে বাড়াতে পারিনি।

● শিক্ষাস্তরের আনুপাতিক ব্যয় হওয়া উচিত—বিদ্যালয়স্তরে দুই-তৃতীয়াংশ এবং উচ্চশিক্ষায় এক-তৃতীয়াংশ।

● আর্থিক সম্পদের একটা বড়ো অংশ কেন্দ্রীয় সরকারকেই বহন করতে হবে কারণ রাজস্ব আদায়ের সিংহভাগই কেন্দ্রীয় কোশাগারে জমা পড়ে। তবু রাজ্য সরকার, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং স্থানীয় জনগণ তাদের সামর্থ্য অনুসারে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করবে।

কেন্দ্রীয় সরকার মূলত যেসব খাতে আর্থিক অনুদানের সহায়তা করে তা হল—

● অনুমোদিত কলেজগুলিতে

● প্রাথমিক শিক্ষা ও শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে

● স্নাতকোত্তর শিক্ষায়

● সেন্টার অফ অ্যাডভান্স স্টাডিজ

● রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়

● কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়

● শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ

● উচ্চশিক্ষায় বৃত্তি দেওয়া

● কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়

● বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা ও প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠান

● নবোদয় বিদ্যালয়

● অতি উন্নত কলেজ

● অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজ ইত্যাদি।

অতি সম্প্রতি উচ্চশিক্ষায় সম্পূর্ণ **নিজ অর্থ দ্বারা পরিচালিত (self-financed)** উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে যার আর্থিক উৎস হল উচ্চহারে ছাত্রবেতন ও capitation fee থেকে সংগৃহীত অর্থ। কিছু আন্তর্জাতিক শিক্ষাসংস্থা যেমন—UNICEF, UNESCO প্রভৃতি বিদেশি সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (UGC) উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প, রক্ষণাবেক্ষণের

উপকরণ বা পুস্তক কিনতে, ছাত্র ও শিক্ষকদের বাসস্থান নির্মাণে, ছাত্রবৃত্তি বা fellowship প্রদানে, গবেষণা বা উচ্চতর অধ্যয়নের অনুদান প্রদানে, পরীক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত কর্মসূচিতে, শতবার্ষিকী উৎসব পালনে, বিভিন্ন সেমিনার, ওয়ার্কশপ বা কনফারেন্স আয়োজনে প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুর করে থাকে।

রাজ্য সরকারগুলি তাদের সীমিত আর্থিক সামর্থ্যের জন্য শিক্ষা উন্নয়ন বা শিক্ষা পরিকল্পনাখাতে কেন্দ্রীয় অনুদানের ওপর বহুলাংশে নির্ভর করে থাকে যা বিভিন্ন জেলা পরিষদ, পৌরসভা বা স্থানীয় সংস্থা মারফত Grant-in-aid রূপে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যয় করা হয়।

রাজ্য বাজেটে মূলত তিনটি অংশ থাকে—

(১) পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয় (Nonplan expenditure)

- শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের বেতন
- দৈনন্দিন প্রতিষ্ঠান পরিচালনার রাহা বা contingency খরচ
- পরিকাঠামোর প্রতিপালন (maintenance) ব্যয়

(২) পরিকল্পনাখাতে ব্যয় (Plan expenditure)

- নতুন বিদ্যালয়, কলেজ, বা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন
- নতুন শিক্ষক—অশিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামোর উন্নয়নসাধন
- নতুন পাঠ্যবিষয় বা গবেষণা প্রকল্প চালু করা

(৩) কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্পখাতে ব্যয় (Expenditure on Central Government Project)

- নতুন শিক্ষাপ্রকল্প বা প্রশিক্ষণ
- নারী শিক্ষা, স্বাক্ষরতা প্রকল্প বা সর্বশিক্ষা অভিযান
- বৃত্তিমূলক শিক্ষার উন্নয়ন প্রকল্প
- বিশেষ প্রকল্প যেমন, বিভিন্ন প্রতিবন্ধী উন্নয়ন প্রকল্প

৪.৭ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেসরকারিকরণ (Privatisation of Educational Institutions)

ভারতের শিক্ষাদান ও শিক্ষা প্রসারের মূল দায়িত্ব বরাবরই সরকারি কর্তৃপক্ষ পালন করে এসেছে। যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে পরিচালিত হত। বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারি পুঁজির প্রবেশ এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গো সঙ্গো সমান হারে শিক্ষার সুযোগসুবিধা সেভাবে প্রসারিত হয়নি বলেই সরকারি সীমিত সমার্থ্যের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগ এখন রমরমিয়ে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এই বেসরকারিকরণের মূল কারণ হিসেবে জনবিস্ফোরণ, ক্রমবর্ধমান শিক্ষার চাহিদা, আর্থিক বৈষম্য ও সামাজিক চাপ তথা কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তাকে দায়ী করা যেতে পারে। সরকার অনুমোদিত অথবা সম্পূর্ণ বেসরকারি নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি এই ব্যক্তিমালিকানায় বা ট্রাস্ট সমিতি বা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় সংগঠনের আওতাধীন। সরকার অনুমোদন দিলেও এইসব ক্ষেত্রে কোনো আর্থিক অনুদান বা পরিচালন ব্যবস্থায় কোনো হস্তক্ষেপ করে না। এইসব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি মূলত সামাজিক উদ্দেশ্যে স্থাপিত হলেও তাদের বাণিজ্যিক অভিমুখ অস্বীকার করা যায় না। সমালোচকদের মতে, এরা একধরনের আর্থিক মুনাফা লোটার প্রতিষ্ঠান।

শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের বিরুদ্ধে বহু গণ আন্দোলন হওয়া সত্ত্বেও সরকারি ক্ষেত্রে সুযোগ সম্প্রসারণের অসুবিধে এবং কর্মীদের দক্ষতা ও দায়বদ্ধতার অভাবই আজ আমাদের ক্রমশ বেসরকারি উদ্যোগের পথে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। যার ফলে আমরা বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার এই সমান্তরাল ধারাকে অস্বীকার করতে পারি না। সংবিধান প্রণেতারা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকার ৩০ নং ধারা অনুসারে ভাষাগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্যে সীমিত রেখেছিলেন যারা বিশেষ ক্ষমতাবলে সরকারী আর্থিক অনুদান পেয়ে থাকে। কোঠারি কমিশনের মতে শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সরকারি হাতে থাকা উচিত। বর্তমান সুপ্রিমকোর্টের আদেশে দেখা যায়, কিছু বৃত্তিগত শিক্ষার ক্ষেত্রে ৫০% পর্যন্ত মেধার ভিত্তিতে ভরতির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাকি ৫০% আসন ম্যানেজমেন্ট কোটার অধীন। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের যথাযথ সুযোগ দেওয়ার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লাভ সুনিশ্চিত করার মধ্যে যে ভারসাম্য রাখা দরকার তা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই হয়ে ওঠে না। সরকারি নিয়মনীতি অনুসারে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনব্যবস্থা সম্পর্কে আরও চিন্তাভাবনার প্রয়োজন।

৪.৭.১ সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠান (Government and Nongovernment Institutions)

আগেই বলা হয়েছে যে, পরিকাঠামোগত দিক থেকে ও কর্মীদের দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা অনুসারে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির সরকারি প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অপেক্ষাকৃত এগিয়ে থাকলেও তা কখনোই ছাত্রছাত্রীদের গুণগত উৎকর্ষ সাধনের পরিচায়ক নয়। তিলক কমিটির (1991) মত অনুসারে—

● বেসরকারিকরণের মূল লক্ষ্য যেখানে আর্থিক লাভ তা কখনোই শিক্ষাগত উৎকর্ষ লাভ করতে পারে না।

● Self-financed বা শিক্ষার্থীর নিজ খরচে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলি ভরতির ক্ষেত্রে মেধার চেয়েও অর্থবলের ওপর বেশি জোর দিয়ে থাকে। এরফলে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তথা মেধাবী এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল শ্রেণির মধ্যে এক শিক্ষাগত বৈষম্য সৃষ্টি হয়ে থাকে।

● উচ্চশিক্ষায় সরকারি অনুদানের বা অর্থব্যয়ের ভূমিকা ও পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার জন্যই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্ম এবং ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে অনেকের মতে সরকারি প্রতিষ্ঠানের তুলনায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অনেক কম রাজনৈতিক প্রভাবযুক্ত। যদিও এই মত সর্বাংশে ঠিক নয় কারণ বহু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক বহুত্ববাদ অপেক্ষা একক মতবাদের প্রাধান্য দেখা যায়।

● সরকারি নীতি অনুসারে অনুদানের সিংহভাগ প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যয় হওয়ার ফলে তুলনামূলকভাবে উচ্চশিক্ষার দায়িত্ব বেসরকারি হাতেই বেশি করে ন্যস্ত হয়েছে।

● কিছু কিছু ক্ষেত্রে একধরনের মধ্যপন্থাও অবলম্বন করা হয়ে থাকে—যেখানে সরকারি অর্থের অনুদান সত্ত্বেও মূলত বেসরকারি পরিচালনায় প্রতিষ্ঠানটি চলে।

● সাধারণভাবে কিছু স্বনির্ভর বা autonomous শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরিতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে যাতে সরকারি, আর্থিক দায়ভার ও পরিচালনভার কিছুটা হলেও হ্রাস পায়। বাজার অর্থনীতিতে এইসব স্বনির্ভর বা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব অস্বীকার করা আজ আর সম্ভব নয়। তাই আমাদের সমাজে এই দুই-এর মধ্যে এক সুস্থ ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। মোটা টাকার capitation fee, ভরতির দুর্নীতি, উপযুক্ত শিক্ষকের নির্বাচন, স্বচ্ছ পরীক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বহু সমালোচনা আছে বলেই কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও সুপারিশ অত্যন্ত কার্যকরী হতে পারে বলে মনে করা হয়।

৪.৮ সারসংক্ষেপ (Summary)

শিক্ষার ব্যয়ভার নির্বাহ করার জন্য এবং শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতিপালনের জন্য প্রাচীনকাল থেকেই নানারকমের আর্থিক সাহায্যের প্রচলন ছিল। প্রধানত রাজারা বা মধ্যযুগের সম্রাটরাও শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতেন। ইংরাজি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার দরুন যে আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি তৈরি হয়েছিল তাদের ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারি অনুদানের সুপারিশ প্রথম পাওয়া যায় উডের প্রতিবেদনে। পরবর্তীকালে ধাপে ধাপে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি অর্থের বরাদ্দ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে মূলত সরকার নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে। সরকার শিক্ষার ব্যয়নির্বাহ করার জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করেন তাকে বলা হয় আর্থিক অনুদান। আনুপাতিক অনুদান, শ্রেণিভিত্তিক অনুদান, ক্ষতিপূরণ অনুদান, ও বহুবিধ অনুদান এই চারপ্রকার সরকারি অনুদানের প্রথা বর্তমানে প্রচলিত আছে।

আর্থিক অনুদানের প্রধানতম উৎস কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার। এ ছাড়াও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ট্রাস্ট ইত্যাদি শিক্ষার জন্য অর্থব্যয় করে। অনেকসময় এককালীন ব্যক্তিগত দানও শিক্ষার প্রসারে বা উৎকর্ষ সাধনের জন্য পাওয়া যায়। সরকারি অনুদানের নীতি অনেকগুলি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। এরমধ্যে অন্যতম হল, জনসাধারণের চাহিদা, জনসংখ্যার বৃদ্ধি, সমাজে শিক্ষার গুরুত্ব, অর্থনৈতিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ইত্যাদি। কোঠারি কমিশন শিক্ষার ব্যয়ভার নির্বাহ সম্বন্ধে কয়েকটি সুস্পষ্ট সুপারিশ করেছেন যার অন্যতম হল কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ। কেন্দ্রীয় সরকার বাজেট বরাদ্দের মধ্যে সরাসরি অর্থ মঞ্জুর করার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন মারফত উচ্চশিক্ষার আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকে। অনুমোদিত কলেজ, শিক্ষক শিক্ষণ, কারিগরি শিক্ষা, পেশাদারি শিক্ষা, গবেষণাগার, গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষ উচ্চমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির জন্য আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকেন। রাজ্য সরকারও অনুরূপ ক্ষেত্রে একইভাবে আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকে। সরকারি ব্যয় তিনটি খাতে ভাগ করা হয়। পরিকল্পনাখাতে ব্যয়, পরিকল্পনা বহির্ভূতখাতে ব্যয় এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্পখাতে ব্যয়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সরকারি আর্থিক সামর্থ্য পাল্লা দিতে না পারায় বর্তমানে ব্যাপকভাবে শিক্ষার বেসরকারিকরণ হচ্ছে। শুধুমাত্র ছাত্র বেতন ও ক্যাপিটেশন ফি-র ভিত্তিতে বহু সাধারণ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। এরফলে শিক্ষা ক্রমশ আর্থিকভাবে স্বচ্ছল শ্রেণির আয়ত্তে চলে যাচ্ছে।

৪.৯ প্রশ্নাবলি (Questions)

১। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) শিক্ষায় অর্থবরাদ্দের সূত্রপাত কীভাবে হয়েছিল?

(খ) আর্থিক অনুদান কাকে বলে?

(গ) আনুপাতিক অনুদান ব্যবস্থা কী?

(ঘ) প্রতিষ্ঠানের বেসরকারিকরণ কাকে বলে?

(ঙ) সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য?

২। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) অনুদানের প্রকারভেদ হয় কেন?

(খ) শ্রেণিভিত্তিক অনুদান কাকে বলে উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

(গ) আর্থিক অনুদানের উৎস কী?

(ঘ) পরিকল্পনাখাতে ব্যয় এবং পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয় কথা দুটির অর্থ কী?

(ঙ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেসরকারিকরণের কয়েকটি অসুবিধার কথা বলুন।

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) শিক্ষায় আর্থিক অনুদানের প্রকারভেদগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করুন এবং ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা থেকে উপযুক্ত উদাহরণ দিন।

(খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেসরকারিকরণের প্রয়োজন কেন? এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করুন।

একক ৫ ❑ পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান (Inspection and Supervision)

গঠন (Structure)

৫.১ প্রস্তাবনা

৫.২ উদ্দেশ্য

৫.৩ পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের ধারণা

৫.৩.১ পরিদর্শন ও পরিদর্শক

৫.৩.২ তত্ত্বাবধান

৫.৪ তত্ত্বাবধায়কের গুণাবলি

৫.৫ আধুনিক তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা

৫.৬ সারসংক্ষেপ

৫.৭ প্রশ্নাবলি

৫.১ প্রস্তাবনা (Introduction)

শিক্ষা প্রশাসনের তাত্ত্বিক ভিত্তি যাই হোক না কেন, অথবা আর্থিক দায়দায়িত্ব যে ভাবেই বণ্টন করা হোক না কেন, তাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি কতটা কার্যকর করছে তার জন্য একটা নজরদারি তথা সমন্বয় ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণ, আদেশ নির্দেশ, সম্পদের সদ্‌ব্যবহার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি সঠিকভাবে পরিচালিত করার ভার শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের হাতেই ছেড়ে দিলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এখানেই পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের গুরুত্ব। আবার পরিদর্শনের নামে অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধীন ও স্বাভাবিক বিকাশকে ব্যাহত করতে পারে। এইসব কারণে শিক্ষা প্রশাসনের পাঠে পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৫.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

● পরিদর্শন ও পরিদর্শক সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা দিতে পারবেন এবং পরিদর্শনের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে অবহিত হবেন।

● তত্ত্বাবধানের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

● তত্ত্বাবধায়কের গুণাবলি উল্লেখ করতে পারবেন।

● আধুনিক তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

৫.৩ পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের ধারণা (Concept of Inspection and Supervision)

পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের মধ্যে সীমারেখা টানা কঠিন। কারণ তত্ত্বাবধানের জন্য পরিদর্শক প্রেরণ ও পরিদর্শন আবশ্যিক। আবার পরিদর্শন শুধুমাত্র ত্রুটি খোঁজার জন্য কখনোই ব্যবহৃত হয় না। ত্রুটির কারণ অনুসন্ধান এবং প্রতিকারও পরিদর্শন ব্যবস্থার অংশ। জটিল ও ব্যাপক শিক্ষা প্রশাসনকে সচল রাখার জন্য এই দুই প্রক্রিয়ার ভূমিকা অপরিহার্য। কিন্তু বর্তমানে তত্ত্বাবধানের ধারণা অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। সেজন্য প্রথমে পরিদর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করে তারপর তত্ত্বাবধানের বিষয়টি কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

৫.৩.১ পরিদর্শন ও পরিদর্শক (Inspection and Inspector)

প্রথমেই বলা হয়েছে যে, আধুনিক ধারণা অনুসারে পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান এই দুটি শব্দকে আলাদাভাবে বিচার করা যায় না। কারণ পরিদর্শন মূলত প্রাচীন ধারণা অনুসারে ব্যবহৃত হয় যেখানে কোনো প্রশাসনিক বা রাজস্বসংক্রান্ত কাজের ক্ষেত্রে সবকিছু ঠিকঠাক চলছে কিনা তা দেখাশোনা করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিদর্শকদের মাধ্যমে একধরনের পরিদর্শন ব্যবস্থার প্রয়োজন হত। ব্রিটিশ শাসনকালে শাসকরা তাদের নিজস্ব প্রশাসনিক দায়িত্ব সহজ করার জন্য 'ইনস্পেকটর রাজ' ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন। যা স্বাধীনতার এত বছর পরেও পুরোপুরি উঠে যায়নি। এক্ষেত্রে পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা তাদের সৃষ্টি করা মান অনুযায়ী অধস্তন কর্মীদের কাজের মূল্যায়ন করা। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পরিদর্শন কথাটি অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কারণ পরিদর্শন নামক কাজটির ক্ষেত্র ও উদ্দেশ্য খুব একটা বিস্তৃত নয়। পরিদর্শন (Inspection) বলতে কোনো প্রতিষ্ঠানে এক বা একাধিক উচ্চতর ক্ষমতাসম্পন্ন পরিদর্শক পাঠিয়ে প্রতিষ্ঠানের কাজের মূল্যায়ন করা বোঝায়, যা অনেক বেশি কৃত্রিম, তাৎক্ষণিক, অগণতান্ত্রিক এবং বাইরে থেকে আরোপিত। পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য কোনো সংস্থার গুণগত ও পরিমাণগত মান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়াকে বোঝায়, যার দ্বারা রাষ্ট্রীয় বা রাজ্যের

কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত মান নীতি ও আদেশ নির্দেশ যথাযথভাবে কার্যকর করা হচ্ছে কিনা তা বিচার করা যায়। গতানুগতিক পদ্ধতিতে এই পরিদর্শন (Inspection) কাজটির মধ্যে একটি কর্তৃত্ব করার মনোভাব লুকিয়ে থাকে। ধরে নেওয়া হয় যে, পরিদর্শকের জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে শেষ কথা। ওই প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শকের নির্দেশ মানতে বাধ্য থাকে ফলে পরিদর্শন ব্যবস্থাটির প্রতি একধরনের বিশেষ ভীতি বা সমীহ কাজ করে। অনেকসময় অনেক প্রতিষ্ঠান একধরনের তাৎক্ষণিক কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করে পরিদর্শককে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে। প্রশাসনিক স্তরে নানা দুর্নীতির সুযোগও এরফলে এসে যায়। যিনি পরিদর্শন করেন তিনি যেহেতু মূল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে খুব বেশি ওয়াকিবহাল থাকেন না তাই শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত বৈষম্য, আগ্রহ ও প্রবণতা এবং নিজস্ব চাহিদা তার অজানাই থেকে যায়। প্রশাসনিক কাজের চাপের মধ্যে কর্তৃত্বের মনোভাব ও কড়া নির্দেশাবলির ভীতির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গঠনমূলক উন্নতি, শিক্ষকদের কাজের স্বাধীনতা এবং শিক্ষামূলক পরীক্ষানিরীক্ষা সবই মূল আলোচনা বা বিবেচনার বাইরে থেকে যায়। ফলে কেবলমাত্র সরকারি স্তরে গৃহীত প্রশাসনিক নিয়মাবলি প্রয়োগের চেষ্টা ছাড়া কোনো উন্নয়নমূলক কাজই এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হতে পারে না। সরকারি অনুদানের অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা তা দেখাও পরিদর্শন ব্যবস্থার একটি মূল উদ্দেশ্য। এর মূল দায়িত্ব পালন করেন জাতীয়, রাজ্য বা জেলাস্তরে নিযুক্ত বিভিন্ন সরাকারি আধিকারিকগণ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুদান, নিয়ন্ত্রণ এবং আয়ব্যয়ের হিসেব পরীক্ষা করা, সংশোধনমূলক নানা নির্দেশনা ইত্যাদি দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে পরিদর্শন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। যে-কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশের উন্নতি করা, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের কাজের বিষয়ে গঠনমূলক ও সৃষ্টিমূলক নির্দেশ দেওয়া ও নানা সমস্যাসংকুল পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে সাহায্য করা ইত্যাদি পরিদর্শন ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হলেও সমালোচকরা মনে করেন পরিদর্শন (Inspection) ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ত্রুটি খুঁজে বার করা, প্রশাসনিক নিয়মকানুন অত্যন্ত কড়াভাবে তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া এবং সর্বোপরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সবদিক থেকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা। তাই মুদালিয়ার কমিশন পরিদর্শকের বদলে 'শিক্ষা অফিসার' বা 'শিক্ষা পরামর্শদাতা' কথাটি ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ভারতীয় শিক্ষা কমিশনও পরিদর্শন ব্যবস্থার বিভিন্ন দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে উল্লেখ করে এর আমূল সংস্কার সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছেন। তাঁদের মতে এই ব্যবস্থা একপ্রকার নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন পরিকল্পনা অনুসারে হওয়া উচিত

যার দায়িত্বে থাকবেন বিশিষ্ট শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা যাতে তাঁদের পরামর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সমাজ-অভিমুখী করে তুলতে সাহায্য করে। বর্তমানে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে National Assessment and Accredition Council বা NAAC-এর মূল্যায়ন প্রক্রিয়া মূলত জাতীয় শিক্ষা কমিশন ও পরবর্তীকালে জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী একটি তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই বিষয়ের নেতিবাচক দিকগুলি মাথায় রেখেই সমাজবিজ্ঞানীদের দীর্ঘ গবেষণার ফলে যে উন্নততর সরকারি বা প্রশাসনিক পরিসেবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাকেই বলে তত্ত্বাবধান (supervision)। এই তত্ত্বাবধানের কাজটি পরিদর্শনের তুলনায় অনেক বেশি গণতান্ত্রিক, উন্নয়নমূলক, মানবিক ও গুণগতভাবে উন্নত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুণগত মান উন্নত করার ক্ষেত্রে পরিদর্শনের মতো সংকীর্ণ ও নেতিবাচক ব্যবস্থার তুলনায় তত্ত্বাবধান অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য।

৫.৩.২ তত্ত্বাবধান (Supervision)

আক্ষরিক অর্থে পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য বা কাজের ধরন আরও অনেক পরিমার্জিত, ব্যাপকতর এবং গণতান্ত্রিক রূপ গ্রহণ করেই তত্ত্বাবধান (Supervision) ধারণাটির জন্ম দিয়েছে। আধুনিক শিক্ষাজগতে তাই পরিদর্শনের (Inspection) উন্নততর ধারণা তত্ত্বাবধানই (Supervision) অপেক্ষাকৃত বেশি গ্রহণযোগ্য। যে-কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ক্রিয়াকলাপ ও কর্মপরিকল্পনার বিষয়ের তত্ত্বাবধান এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে যার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়ন ঘটে। তত্ত্বাবধান বা Supervision বিষয়ে নিম্নলিখিত সংজ্ঞাগুলি বহুল প্রচলিত এবং অপেক্ষাকৃত বেশি গ্রহণযোগ্য —

● William. H. Burton এবং Bruckner বলেছেন, —'Supervision is an expert technical service primarily aimed at studying and improving co-operatively all factors which affect child growth and development.' অর্থাৎ, তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বৃদ্ধি ও বিকাশের সমস্ত উপাদানগুলিকে সহযোগিতার মাধ্যমে চর্চা ও উন্নতি করা।

● H. P. Adam এবং F. G. Dickney-এর মতে — 'Supervision is a planned programme for improvement of Institutions'. অর্থাৎ, প্রতিষ্ঠানের সার্বিক মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনাই হল তত্ত্বাবধান বা Supervision.

● Sam. H. Mooran মনে করেন — 'Supervision is used to describe those activities

which are primarily and directly concerned with studying and improving the conditions which surround the learning and growth of pupils and teachers'. অর্থাৎ শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা ও বিকাশ যেসব বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় তাদের চর্চা ও উন্নতি করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যাবলির সরাসরি বর্ণনা করাই তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্য।

● Kimball Wiles এর মতে — 'Supervision is an assistance in the development of a better teaching–learning situation.' অর্থাৎ, তত্ত্বাবধান হল উন্নততর শিখন-শিক্ষণ পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা।

● C. V. Good বলেন— 'All efforts to designate school officials to direct towards providing leadership to teachers and other educational workers in the improvement of instrument, involves the stimulation of professional growth and development of teacher, the selection and revision of educational objective, materials of instruction, methods of teaching and evaluation of instruction.' অর্থাৎ, শিক্ষণ প্রক্রিয়া উন্নয়নের জন্য শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতার বিকাশ এবং শিক্ষণের উদ্দেশ্য, উপকরণ, পদ্ধতি ও মূল্যায়নে সঠিক নির্বাচন ও পুনর্মূল্যায়ন প্রধানত তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়ার অন্তর্গত।

গণতান্ত্রিক প্রশাসনিক কাঠামোয় এই তত্ত্বাবধানের প্রক্রিয়াটি একটি পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর ভিত্তি করে কাজ করে যার দ্বারা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা উৎসাহিত বোধ করেন, পঠনপাঠনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন ঘটে। এই গঠনমূলক ও উন্নয়নমূলক পরিসেবার আধুনিক নামই হল তত্ত্বাবধান বা Supervision.

৫.৪ তত্ত্বাবধায়কের গুণাবলি (Qualities of a Supervisor)

তত্ত্বাবধায়কদের কয়েকটি সাধারণ গুণাবলি এখানে উল্লেখ করা হল।

● গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজ করার সামর্থ্য।

● শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের সঙ্গো সহযোগিতামূলক কাজ ও আলোচনার মাধ্যমে সুসম্পর্ক স্থাপন।

● বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিকোণ থেকে পরীক্ষানিরীক্ষা চালানোর দক্ষতা।

● আন্তরিকতা এবং সমবেদনামূলক মনোভাব।

● দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও উপস্থিত বুদ্ধি।

● গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি।

● শিক্ষাবিজ্ঞানের অন্তর্গত উপাদানগুলি সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞান।

● পেশাগত, ব্যক্তিগত দক্ষতা এবং সততা।

● ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অগ্রিম চিন্তা করার ক্ষমতা।

● প্রশাসনিক সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা।

আধুনিক সমাজবিজ্ঞানে একজন তত্ত্বাবধায়ক (supervisor) বলতে এমন একজন ব্যক্তিকে বোঝানো হয় যার মধ্যে এই সকল গুণাবলির উপযুক্ত সমন্বয় ঘটে।

৫.৫ আধুনিক তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা (Role of Modern Supervisor)

তত্ত্ববধায়কের যেসব গুণাবলির কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে তার প্রত্যেকটির সঙ্গোই একজন ভালো, দক্ষ তত্ত্বাবধায়কের আদর্শ ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবু সুনির্দিষ্টভাবে তত্ত্বাবধায়কের মূল কাজগুলি এখানে উল্লেখ করা হল—

● শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট প্রকৃতি অনুসারে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সঠিকভাবে নিরূপণ করা হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করা।

● বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন পদ্ধতির মূল্যায়ন করা।

● বিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থার গণতান্ত্রিকতা বিচার করা।

● শিক্ষণ পদ্ধতির কার্যকারিতা বিচার করা।

● প্রতিষ্ঠানটির অনুসরণ করার সময়তালিকা (Timetable) কতখানি ত্রুটিমুক্ত তা দেখা।

● অনুসৃত পাঠক্রম কতখানি যুক্তিযুক্ত তা বিশ্লেষণ করা।

● শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশের উন্নতির দিকটি তত্ত্বাবধান করা।

● প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন প্রশাসনিক নথি পরীক্ষা করা এবং আর্থিক অনুদানের সঠিক ব্যবহার হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করা।

● শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত চাহিদাপূরণ ও বিকাশসাধন ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

● সহপাঠক্রমিক কাজের প্রকৃতি ও গুণগতমান পর্যালোচনা করা।

● প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন কর্মীদের ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার মূল্যায়ন করা।

● পাঠক্রমের উন্নয়ন, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, পরিবেশের উন্নয়ন এবং সর্বোপরি শিক্ষণ পদ্ধতির গুণগত মানোন্নয়ন আধুনিক তত্ত্বাবধায়কের প্রধান ভূমিকার মধ্যে পড়ে।

আধুনিক তত্ত্বাবধায়ক শুধু নিজে পণ্ডিত ব্যক্তি হলেই চলবে না, আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব, শিক্ষণ পদ্ধতি, শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর সম্যক অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। ব্যক্তিগতভাবে, তাঁর মনোভাব হবে সহযোগিতামূলক, কাজের নীতি হবে গণতান্ত্রিক এবং সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী এবং অভিভাবকদের সহযোগিতায় তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করলেই আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি উপযুক্তভাবে উন্নতি লাভ করতে পারবে।

৫.৬ সারসংক্ষেপ (Summary)

পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান দুটি অবিচ্ছিন্ন শব্দ হলেও পরিদর্শন অনেকটা সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। পরিদর্শন বলতে নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা অধস্তন কর্মচারীদের কাজের মূল্যায়নকে বোঝায়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে কর্তৃত্ব করার মনোভাব এবং ভীতি। পরিদর্শন প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতার প্রশ্নটিও জড়িত। সুতরাং প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে পরিদর্শককে সন্তুষ্ট করাই প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিষ্ঠানের স্বাধীন চিন্তাভাবনা করা এবং স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে উন্নয়নের চেষ্টা ব্যাহত হয়। শুধুমাত্র নির্দেশ পালনের প্রবণতা জন্মায়। এই কারণে মুদালিয়ার কমিশন ও ভারতীয় শিক্ষা কমিশন পরিদর্শন শব্দটি ও পরিদর্শন ব্যবস্থার পরিবর্তন করার সুপারিশ করেছিলেন।

তত্ত্বাবধান তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি গণতান্ত্রিক, সহযোগিতামূলক এবং উদারপ্রক্রিয়া আর সেজন্য অনেক বেশি গ্রহণযোগ্যও। বিভিন্ন প্রশাসন বিশেষজ্ঞ তত্ত্বাবধান কথাটির আলাদা আলাদা সংজ্ঞা দিয়েছেন। এইসব সংজ্ঞায় তত্ত্ববধান প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে যেসব বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে আছে, শিক্ষণ ও শিক্ষণের উন্নয়নের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা, ছাত্রছাত্রীদের বিকাশ ও বৃদ্ধির উপাদানগুলির চর্চা, বর্ণনা ও উন্নতি করা, শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করা এবং প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় নেতৃত্ব দেওয়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের সহযোগিতায় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় শিক্ষা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন ঘটানো ইত্যাদি।

এই কারণে তত্ত্বাবধায়ককে শুধুমাত্র তাঁর নিজস্ব বিষয়ে পণ্ডিত হলেই চলে না। শিক্ষার তত্ত্ব, পদ্ধতি ও মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁদের যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। প্রশাসনিক দক্ষতা ছাড়াও, নেতৃত্বদানের ক্ষমতা, সকলের সঙ্গে সহযোগিতার মনোভাব, সততা, স্বচ্ছতা ইত্যাদি বিশেষ গুণগুলি থাকা দরকার। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় তত্ত্বাবধায়কদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। শিক্ষার প্রকৃত গুণগত মানোন্নয়ন, পরিকল্পনা এবং পরিকাঠামোর উন্নয়নে উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়কের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি।

৫.৭ প্রশ্নাবলি (Questions)

১। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) তত্ত্বাবধান কাকে বলে ?

(খ) পরিদর্শন কাকে বলে ?

(গ) আধুনিক তত্ত্বাবধায়কের যে-কোনো দুটি গুণ উল্লেখ করুন।

২। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) পরিদর্শনকে সংকীর্ণ বলা হয়েছে কেন ?

(খ) তত্ত্বাবধানের Kimball Wiles প্রদত্ত সংজ্ঞাটি উল্লেখ করুন ও ব্যাখ্যা করুন।

(গ) আধুনিক তত্ত্বাবধায়কের দুটি ভূমিকা আলোচনা করুন।

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতার দিক থেকে পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের তুলনামূলক আলোচনা করুন। কোন্ ধারণাটি অধিক গ্রহণযোগ্য এবং কেন ?

(খ) তত্ত্বাবধানের সংজ্ঞাগুলি আলোচনা করুন। আধুনিক তত্ত্বাবধায়কের গুণ ও ভূমিকা সম্বন্ধে উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

References :

- Chakraborty, Dr. D. K. শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা
- Chakraborti, Dr. P. K., Sengupta, Dr. Madhumala, Nag, Dr. Subir Educational Management
- Chandan. J. S. Management Theory & Practice
- Das. B. C, Sengupta D, Roy. P. শিক্ষায় ব্যবস্থাপনা
- Dennison W. F. & Shenton. Ken Challenges in Educational Management
- Kochhar. S. K. Secondary School Administration
- NCTE : Policy Perspective in Teacher Education
- Pal, Dhar, Das, Banerjee —শিক্ষা ব্যবস্থাপনা
- Rust, Pitman, Management Guidelines for Teachers
- Rai B. C. School Organisation and Management

একক ৬ ❑ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা (Educational Management)

গঠন (Structure)

প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

৬.১ ব্যবস্থাপনার ধারণা

৬.২ ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের সম্পর্ক

৬.৩ শিক্ষা প্রশাসকের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলী

৬.৩.১ পরিকল্পনা

৬.৩.২ সংগঠন

৬.৩.৩ কর্মী নিয়োগ

৬.৩.৪ নেতৃত্ব দান

৬.৩.৫ প্রেষণা সৃষ্টি

৬.৩.৬ নিয়ন্ত্রণ রক্ষা

৬.৩.৭ সমন্বয় সাধন ও যোগাযোগ

৬.৪ ব্যবস্থাপনার নিয়মাবলীর শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ

৬.৪.১ শিক্ষা প্রশাসকের কার্যাবলী

৬.৪.১.১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্পদ, পরিকল্পনা ও নীতি সংক্রান্ত কাজ

৬.৪.১.২ আর্থিক অনুদান সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাবলী

৬.৪.১.৩ শিখন সংক্রান্ত প্রশাসনিক কাজ

৬.৪.১.৪ শিক্ষার্থীর পূর্ণ বিকাশ

৬.৪.১.৫ শিক্ষক নিয়োগ

৬.৪.২ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে বৃহত্তর সমাজের সংযোগ স্থাপন

৬.৫ শিক্ষা ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা

৬.৫.১ শিখন-শিক্ষণের ক্ষেত্রে

৬.৫.২ সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে

৬.৬ সারসংক্ষেপ

৬.৭ প্রশ্নাবলী

প্রস্তাবনা (Introduction)

ব্যবস্থাপনা একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াটি সম্বন্ধে একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করা প্রয়োজন। ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনকে অনেক সময় সমার্থক ধরা হয়। এখানে এই এককে দুটি প্রক্রিয়ার তুলনামূলক ব্যাখ্যা করে এই দুটির ধারণা পরিস্ফুট করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার নীতির প্রয়োগমূলক দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। এর সাথে শিক্ষা ব্যবস্থাপনার কার্যাবলীগুলি কি কি তাও আলোচিত হয়েছে।

ব্যবস্থাপনার কিছু বিজ্ঞানসম্মত ও পরীক্ষিত নিয়মকানুন আছে যেগুলি প্রয়োগ করে শিক্ষা প্রশাসনকে সুদক্ষ ও কার্য্যকরী করা যায়। এই নিয়মকানুনগুলি জানা থাকা বাঞ্ছনীয়।

পরিশেষে শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় শিক্ষকের ভূমিকা ও শিক্ষকের সামাজিক দায়িত্ব কি হওয়া উচিত এ সম্বন্ধে বক্তব্য আছে, যা শিক্ষাবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীর জানা থাকা প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ধারণা ও সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষা প্রশাসনের কাজগুলি চিহ্নিত করতে পারবেন।
- শিক্ষা ব্যবস্থাপনার নিয়মাবলী কিভাবে প্রয়োগ করা হয় তা অনুধাবন করতে পারবেন।
- ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা সম্বন্ধে অবহিত হবেন।

৬.১ ব্যবস্থাপনার ধারণা (Concept of Management)

যে কোন একটি সংস্থা বা Organisation হল একটি সামাজিক গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠী কিছু উদ্দেশ্য পূরণের জন্য গঠিত হয়ে থাকে। ব্যবস্থাপনা বা management বলতে সাধারণতঃ একটি প্রক্রিয়াকে বোঝায়, যার উদ্দেশ্য হল কর্মীদের বা সদস্যদের সহায়তায় গোষ্ঠী বা সংস্থার উদ্দেশ্য পূরণ করে তার নিজস্ব লক্ষ্যে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা।

সাধারণতঃ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াটির মূল দুটি উদ্দেশ্য থাকে—

— এক, সংস্থাকে সর্বোচ্চ ও উৎকৃষ্ট উৎপাদনে সাহায্য করা শিক্ষা সংগঠনের প্রসঙ্গে উৎপাদন কথাটির পরিবর্তে পরিষেবা কথাটি অধিক প্রযোজ্য।

—দ্বিতীয়, সংস্থার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের পরিপূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা করা।

এই প্রসঙ্গে ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াটির কিছু প্রাথমিক উপাদানের উল্লেখ করা প্রয়োজন। যাতে এ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা সম্ভব হয়।

(১) ব্যবস্থাপনা হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার বিভিন্ন কাজগুলি হল পরিকল্পনা গ্রহণ করা, সংগঠন, কর্মী নিয়োগ, কর্মীদের পরিচালনা করা ও সমগ্র ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ করা।

(২) ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল সংস্থার মানব সম্পদ ও বৈষয়িক সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে সেই সংস্থার উদ্দেশ্যগুলি পূরণ করা।

(৩) সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজন জ্ঞানমূলক, বিশ্লেষণাত্মক মানসিক ক্ষমতা (Cognitive analylical ability)। যে সব প্রশাসনিক কাজকর্মের মাধ্যমে এই মানসিক ক্ষমতা প্রকাশ পায় তা হল—সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারা (decision making), সংহতি সাধনে সাহায্য করা (Helping coordination), সংগঠনের বিভিন্ন কর্মীদের মধ্যে যোগাযোগ (Communication) রক্ষা করা, এবং ক্ষমতার সঠিক প্রত্যর্পনের (Allocation of power) মাধ্যমে।

(৪) এই প্রক্রিয়াটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সংহতি স্থাপন বা coordination । ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াটি সার্থক হয় যখন মানবসম্পদ ও জড়সম্পদের মধ্যে সঠিক সংযোগ রক্ষা করে কাজ কর্ম পরিচালিত হয়। এখানে বলা যায়, ব্যবস্থাপনা ইংরেজি চারটি m-এর সমন্বয়—অর্থাৎ man, machine, material ও money এই চারটির সুসংবদ্ধ প্রয়োগই হল ব্যবস্থাপনা।

এখানে man অর্থাৎ মানব সম্পদ হল যে ব্যক্তিরা সংগঠনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করেন। Machine বা যন্ত্র কথাটির প্রকৃত অর্থ সংগঠনের উৎপাদন বা পরিষেবা যে কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে পরিকল্পিত লক্ষ্য অর্জনের পথে অগ্রসর হয়। Material কথাটির অর্থ উৎপাদন বা পরিষেবার জন্য আবশ্যকীয় উপাদান সমূহ এবং money হল, বলাবাহুল্য অর্থসম্পদ।

(৫) ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াটি একদিকে যেমন বিজ্ঞানভিত্তিক অন্য দিকে এটিকে একটি বিশেষ কলাও বলা যেতে পারে। যখন একজন প্রশাসক বিজ্ঞানভিত্তিক ও পরীক্ষিত তথ্য কাজে লাগিয়ে কাজকর্ম পরিচালনা করেন তখন তিনি প্রশাসন ব্যবস্থাকে বৈজ্ঞানিক পর্যায়ে নিয়ে যায়, আবার যখন বিজ্ঞাননীতিকে মেনে নিয়ে নিজস্ব অন্তদর্শন বা ভাবনা চিন্তা ও আবেগ আরোপ করে আরও বেশি সুদক্ষভাবে প্রশাসন চালাতে সক্ষম হন তখন তিনি কলাকার।

(৬) ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া হল একটি লুক্কায়িত শক্তি যা সোজা সুজি পর্য্যবেক্ষণ করা যায় না কিন্তু এর প্রতিফলন দেখা যায় সংস্থার উৎপাদন বৃদ্ধি ও সুনাম বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে।

সবশেষে ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দু-একটি সংজ্ঞা না উল্লেখ করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

Mc Farland এর মত অনুযায়ী Management is that process by which managers create, direct, maintain and operate purposive organisation through systematic, Coordinated and Cooperative human efforts. ব্যবস্থাপনা হল সেই প্রক্রিয়া যাতে একজন ব্যবস্থাপক সুশৃঙ্খল, সমন্বিত ও

সহযোগিতাপূর্ণ মানবিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে কোন উদ্দেশ্যমুখী সংগঠনকে সৃজন, নির্দেশদান, ও সচল রাখার কাজে নিয়োজিত থাকেন।

Koontz-এর প্রদত্ত সংজ্ঞাটি আরও ব্যাপক! তাঁর মতে Management is the art of getting things done with people and through informally organised groups. It is the art of creating an environment in which people can perform as individuals and yet cooperate towards attainment of group goals. It is the art of removing blocks for such a performance, a way of optimising effeciency in reaching goals.

ব্যবস্থাপনা হল মানুষকে দিয়ে, অনিয়ত দলের মাধ্যমে কাজ করিয়ে নেওয়ার কলাকৌশল। এই কাজ এমন একটি পরিবেশ তৈরী করার কৌশল যাতে প্রতিটি ব্যক্তি এককভাবে কাজ করলেও, দলগত লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে চলে। এই কাজ (ব্যবস্থাপনা) হল এমন কৌশল যা দলগত লক্ষ্য অর্জনের জন্য যথোপযুক্ত দক্ষতা অর্জনের সমস্ত বাধা দূর করে।

৬.২ ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের পারস্পরিক সম্পর্ক (Relation Between Management and Administration)

সাধারণতঃ মনে করা হয় যে প্রশাসন হল সংগঠনের নীতি নির্ধারণ কার্যাবলী (Policy making) অন্যদিকে ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক লক্ষ্য হল বাস্তব ক্ষেত্রে এই নীতিগুলির সার্থক রূপায়ণ। অতএব বলা যেতে পারে প্রশাসন হল উচ্চস্তরের নীতি নির্ধারণমূলক চিন্তন প্রক্রিয়া এবং ব্যবস্থাপনা সাধারণভাবে কর্ম সম্পাদনের প্রক্রিয়া।

প্রশাসন সংগঠনের সামগ্রিক নীতি, উদ্দেশ্য কার্যাবলী ইত্যাদির পরিকল্পনা রচনা করে আর ব্যবস্থাপনা এই পরিকল্পনাগুলির যথাযোগ্য প্রয়োগ করবার প্রচেষ্টা করে।

অন্যদিকে Kimball এবং Kimball কিন্তু ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের সম্পর্ক সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে ব্যবস্থাপনা একটি সামগ্রিক শব্দ (generic term) যার অনেকগুলির উদ্দেশ্যের একটি হল প্রশাসন (Management is a generic term with wide functions, including administration which is a narrow function).

আবার আধুনিক ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞদের ধারণা অনুযায়ী এই দুই ধরনের কাজের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই—কারণ একই ব্যক্তিকে (কর্মীকে) বিভিন্ন পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রশাসনিক (নীতি সংক্রান্ত) অথবা প্রয়োগমূলক কাজকর্ম সম্পন্ন করতে হয়। শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় বিশেষ করে এই ধরনের দ্বৈত ভূমিকা প্রযোজ্য। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানের দায়িত্ব যেমন দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ব্যবস্থা সুচারু রূপে পরিচালনা করা (ব্যবস্থাপনা বা management) আবার তেমনি প্রয়োজন অনুযায়ী সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের জন্য নতুন নীতি নির্ধারণ করা (প্রশাসনিক কাজ)।

ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন এই দুই এর বিরোধ মীমাংসার জন্য ব্যবস্থাপনাকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে।

অর্থাৎ,

ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া → প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা (administrative management)

ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া → প্রয়োগমূলক ব্যবস্থাপনা (operative management)

প্রশাসনিক ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব হল সংগঠনের নীতি, কৌশল, পরিকল্পনা রচনা করা এবং প্রয়োগমূলক ব্যবস্থাপনা হল সংগঠনের নীতির সার্থক রূপায়ন (executive function) অতএব বলা যায় যে প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা অনেক ক্ষেত্রেই সমার্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

৬.৩ শিক্ষা প্রশাসকের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলী (Managerial functions of educational administration)

ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত যে ধরনের ক্রিয়াকর্মের উল্লেখ করা যায় তা হল নিম্ন প্রকারের—

— সংস্থা বা সংগঠনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরিকল্পনা রচনা করা।

— সংস্থাটিকে সঠিক নেতৃত্ব প্রদান করা।

— কর্মীদের মধ্যে প্রেষণার সৃষ্টি করা এবং

— সংস্থাটিকে নিয়ন্ত্রণ করা।

আরও যে দুটি কাজ একজন ব্যবস্থাপকের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে তা হল কর্মীদের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও যোগাযোগ রক্ষা করা।

৬.৩.১ পরিকল্পনা (Planning)

তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়ার প্রথম পদক্ষেপ হল পরিকল্পনা রচনা করা। পরিকল্পনা করার অর্থ হল সংস্থার প্রতিটি বিভাগ বা ক্ষেত্রের বিশেষ উদ্দেশ্য ও সংস্থার সামগ্রিক বৃহত্তর উদ্দেশ্য নির্ণয় করা এবং এই উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়িত করার জন্য একটি ছক তৈরী করা।

Coombs শিক্ষা পরিকল্পনার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, ...application of rational systematic analysis to the process of educational development with the aim of making education more effective in responding to the needs and goals of its students and society, অর্থাৎ শিক্ষা পরিকল্পনা হল শিক্ষার্থী ও সমাজের লক্ষ্য ও প্রয়োজনের বিচারে শিক্ষার বিকাশকে আরও বেশি সার্থক করে তোলার জন্য শিক্ষার বিকাশের ক্ষেত্রে সুশৃংখল ও যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ প্রয়োগ করা।

বিশেষজ্ঞরা শিক্ষা পরিকল্পনার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন,

- শিক্ষার উদ্দেশ্যের শ্রেণীবিভাগ।

- বর্তমান অবস্থার দুর্বলতা চিহ্নিত করা।
- বিকল্প কার্যক্রমগুলি স্থির করা।
- কার্য পরিকল্পনা রচনা।
- সামগ্রিক প্রক্রিয়াটির নিয়ন্ত্রণ।

৬.৩.২ সংগঠন (Organisation)

সংগঠনের উদ্দেশ্য হল পরিকল্পনাটির মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে প্রতিটি কার্যকে এবং সংস্থার সামগ্রিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার করা। সংগঠনের সাথে জড়িত বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজ কর্ম হল কাজের বিভাজন (Structuring) ক্ষমতার বণ্টন ও সংস্থার প্রতিটি কাজকর্মের সার্থক রূপায়ন।

৬.৩.৩ কর্মী নিয়োগ (Staffing)

সংস্থার বিভিন্ন বিভাগের জন্য কি ধরনের কর্মী প্রয়োজন ও সেই বিভাগ অনুযায়ী কর্মী নিয়োগ করা ব্যবস্থাপনার আর একটি অংশ। শিক্ষামূলক প্রশাসনে শিক্ষক নিয়োগ এই ধরনের কাজের আওতায় পড়ে।

৬.৩.৪ নেতৃত্ব দান (Leadership)

সংগঠনের বিভিন্ন কাজের মধ্যে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল কর্মীদের কাজে উদ্বুদ্ধ করা। এই উদ্দেশ্যে সঠিক নেতৃত্বের ভূমিকা, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। নেতৃত্বের দক্ষতাই একদিকে পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ন, কর্মীদের সংগঠিত করে কাজের গতি নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, অন্যদিকে কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধি, উৎসাহ ও প্রেরণা যোগানো এবং সর্বোপরি লক্ষ্য অর্জনে অবিচল দৃঢ়তা বজায় রাখতে পারে। একজন দক্ষ শিক্ষা প্রশাসককে এই কারণেই নেতৃত্বদানের জন্য তৈরী হতে হয়।

৬.৩.৫ প্রেষণার সৃষ্টি (Motivating)

সংগঠনের উদ্দেশ্য তখনই সাধিত হয় যখন কর্মীরা স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে। এ ব্যাপারে নেতার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে কাজ করে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন কর্মীদের দক্ষতা ও সাফল্যের উপযুক্ত স্বীকৃতি। একজন গণতান্ত্রিক ও মানবিক মনোভাব সম্পন্ন প্রশাসক নেতা কর্মীদের স্বীকৃতি দেওয়ার পরিকল্পনাকে সামগ্রিক পরিকল্পনা রচনার মধ্যে স্থান দিতে ভোলেন না, যা কর্মীদের প্রেষণা জাগ্রত করার এবং বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য।

৬.৩.৬ নিয়ন্ত্রণ রক্ষা (Controlling)

ব্যবস্থাপনার অন্যতম কর্মসূচী হল সংস্থাটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। নিয়ন্ত্রণ করার অর্থ হল সংস্থার উদ্দেশ্যমূলক কাজের মান বজায় রাখা। অর্থাৎ যে উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যত কর্মপন্থা নিয়ে সংস্থাটি শুরু হয়েছে তার সাথে বর্তমান পারদর্শিতার তুলনামূলক বিচার কারণকেই নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বলা যেতে পারে। যে কোন আদর্শ ব্যবস্থাপনায় তিনটি প্রক্রিয়া নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলতে থাকে তা হল নিম্নরূপ—

পরিকল্পনা

↓

পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ন

↓

নিয়ন্ত্রণ

চিত্র ১.১. শিক্ষা ব্যবস্থাপনার তিনটি প্রক্রিয়া

৬.৩.৭ সমন্বয় সাধন ও যোগাযোগ (Coordination and Communication)

ব্যবস্থাপনায় যে আরো দুটি ক্রিয়ার কথা বলা হয় তা হল সমন্বয় সাধন ও যোগাযোগ রক্ষা করা। যে কোন বৃহৎ ও জটিল সংস্থা অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমন্বয় সাধন করার অর্থ হল প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও ঐক্যের ভাব গঠন করা যাতে প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য সহজে ও সঠিকভাবে চরিতার্থ করা সম্ভব হয়। এ প্রসঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব ও অপরিসীম। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজে সমন্বয় তখনই সম্ভব যখন প্রয়োজনীয় তথ্য সংস্থার সকল কর্মীর কাছে সময়মত ও সঠিকভাবে পৌঁছে যায়। উচ্চস্তর থেকে নিম্নস্তর অথবা নিম্ন থেকে উচ্চে এবং তথ্যের সমান্তরাল আদান প্রদান ছাড়া প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম ঠিকভাবে চলতে পারে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিয়মকানুন, সরকারী আদেশ, পরামর্শ ইত্যাদি যদি সকলকে সঠিক সময়ে এবং স্বচ্ছভাবে না জানানো হয় তবে প্রশাসন পরিচালনা করা দুরূহ হয়ে পড়ে।

৬.৪ ব্যবস্থাপনায় নিয়মাবলীর শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ (Application of Management Science in the field of Education)

পূববর্তী একটি এককে ম্যানেজমেন্ট বিজ্ঞানে ব্যবস্থাপনার নীতি ও কার্যাবলী আলোচনা করা হয়েছে। এখন বিচার্য হল যে এই নীতিগুলি শিক্ষা প্রশাসনে কিভাবে প্রয়োগ করা হয়।

ব্যবস্থাপনার যে সাধারণ সংজ্ঞা উল্লেখ করা হয়েছে তার সূত্র ধরেই বলা যায় যে শিক্ষা প্রশাসন ও অন্যান্য প্রশাসনের মতই মানবসম্পদ ও জড়সম্পদের যথাযোগ্য ব্যবহার করে শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল করে। এক্ষেত্রে শিক্ষা প্রশাসক একজন নীতি নির্ধারক এবং সেই সাথে নীতি ও নিয়মের প্রয়োগমূলক দিকটি দেখাও তাঁর দায়িত্ব। শিক্ষা প্রশাসনের ভূমিকা তাই দ্বৈত—তা তিনি যে কোন কর্মক্ষেত্রেই যেমন শিক্ষামন্ত্রক, শিক্ষা পর্যদ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান যাই থাকুন না কেন। অর্থাৎ বলা যেতে পারে শিক্ষা প্রশাসনের দায়িত্ব হল দুই—প্রকারের।

—নীতি বিষয়ক সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং পরিকল্পনা গ্রহণ।

—নির্ধারিত নীতিগুলি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রয়োগ।

এই দুই ধরনের কর্মপ্রক্রিয়া যদিও পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত তবুও বলা যায় যে সাধারণতঃ শিক্ষা অধিকর্তা পরিকল্পনা ও নীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান এই পরিকল্পনা মত শিক্ষার উদ্দেশ্য পূরণে সচেষ্ট থাকেন।

৬.৪.১ শিক্ষা প্রশাসকের কার্যাবলী (Functions of Educational Administor)

শিক্ষা প্রশাসনের কাজগুলিকে আমরা সাধারণত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি।

এক, প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত প্রশাসন সংক্রান্ত কাজ

দুই, প্রতিষ্ঠানের বর্হিজগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রশাসনিক কাজ (যেমন সচিব, শিক্ষা অধিকর্তা ও অবেক্ষক সংক্রান্ত কাজ কর্ম)

সাধারণভাবে শিক্ষা প্রশাসনে নিম্নলিখিত কাজের ধারা পরিলক্ষিত হয়।

৬.৪.১.১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্পদ, পরিকল্পনা ও নীতি সংক্রান্ত কাজ (Functions related to plan, Principles and Resources of the Educational Institutions)

যদিও শিক্ষার সাধারণ নীতি ও নিয়মগুলি বৃহত্তর স্তরে (Macro level) নির্ধারিত হয় তবুও যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয় নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিজস্ব নীতির প্রয়োগ করার জন্য বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজ কর্ম গ্রহণ করে থাকে।

৬.৪.১.২ আর্থিক অনুদান সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাবলী (Administrative Functions related to Financial Grants)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এই ধরনের প্রশাসনিক কাজকে বাজেট এবং হিসাব নিকাশ সংক্রান্ত কাজ বলে ধরা হয়। যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রতিষ্ঠানের সুনাম নির্ভর করে এই ধরনের প্রশাসনিক দক্ষতার উপর। বেসরকারী বা সরকারী যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হোক না কেন আর্থিক অপচয় বন্ধ করে অনুদান এর সর্বোত্তম ব্যবহার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কাজ বলে ধরা হয়।

৬.৪.১.৩ শিখন সংক্রান্ত প্রশাসনিক কাজ (Administration Functions related to Learning)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক দায়িত্ব হল শিক্ষার্থীর শিখন। তাই শিখনমূলক কাজকর্মের তদারকি করা ব্যবস্থাপনার একটি প্রধান কাজ। শিক্ষার সঠিক মান বজায় রাখার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানকে যে সব ক্ষেত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয় তা হল শিখন পদ্ধতি, প্রতিষ্ঠানের শিক্ষামূলক সরঞ্জামের পর্যাপ্ত ব্যবহার, শিক্ষামূলক প্রদীপণের এর প্রয়োগ, বিজ্ঞানসম্মত মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু রাখা, সময় সারণী তৈরি করা। সহপাঠক্রমিক কার্যপ্রণালীর পরিচালনা পরীক্ষাগার, লাইব্রেরীর রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন পাঠ্যপুস্তকের পর্যাপ্ততা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের প্রশাসনমূলক কাজের দিকে।

৬.৪.১.৪ শিক্ষার্থীর পূর্ণ বিকাশ (All round Development of the Learners)

শিক্ষার্থীর শিখনই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। ব্যবস্থাপনার অন্তর্গত আর একটি উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ। এর জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাপকের যে সব কাজকর্ম করতে হয় সেগুলি হল পরামর্শদান (Counselling) স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করা। মধ্যাহ্ন আহারের ব্যবস্থা। অর্থনৈতিক দিক থেকে দূর্বল শিক্ষার্থীদের

জন্য বৃত্তি বা অন্যান্য সাহায্যের ব্যবস্থা করা। ছাত্রাবাসের দেখাশোনা করা, শৃঙ্খলা বজায় রাখা, ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ সমস্যার সমাধান করা ইত্যাদি।

৬.৪.১.৫ শিক্ষক নিয়োগ (Appointment of Teachers)

শিক্ষকদের নিয়োগ ও তাঁদের পেশাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করাও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব। যদিও সরকারী অনুদান প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ এর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অনেকটাই সীমিত। তাহলেও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই প্রশাসনিক দায়িত্ব অনেক বেশি। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান অনেকাংশে নির্ভর করে সুদক্ষ শিক্ষক ও দক্ষ অশিক্ষক কর্মচারী নিয়াগের উপর। শিক্ষক নিয়োগের পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষকের পেশাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির দায়িত্ব ও প্রশাসক কর্তৃপক্ষের। পরিদর্শনের সাহায্যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষকের উত্তরোত্তর যোগ্যতা বৃদ্ধি, তাদের জন্য চাকুরীরত অবস্থায় বিশেষ প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করা, সেমিনার, কর্মশালা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা শিক্ষা প্রশাসনের আবশ্যিক অঙ্গ। এছাড়া আদর্শ শিক্ষা-প্রশাসন ব্যবস্থা শিক্ষকদের মধ্যে প্রেষণার সৃষ্টি করে এবং তাঁদের শিক্ষকতার কাজে উদ্বুদ্ধ করে।

৬.৪.২ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে বৃহত্তর সমাজের সংযোগ স্থাপন (Relating Educational Institutions with Society at Large)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সামাজিক গোষ্ঠীর একটি অঙ্গ। তাই শিক্ষা, প্রশাসনের আর একটি কাজ হল প্রতিষ্ঠানের সাথে সমাজের একটি আদর্শ সম্পর্ক গড়ে তোলা। বিশেষ করে সমাজকল্যাণমূলক কাজে, সামাজিক চেতনা বিকাশে শিক্ষা প্রশাসনের বিশেষ দায়িত্ব আছে। সাক্ষরতা অভিযান, পরিবেশ দূষণরোধ, দরিদ্রভাণ্ডার স্থাপন এই ধরনের সমাজ সেবামূলক কাজ শিক্ষা প্রশাসনের অন্তর্গত।

এছাড়া প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে অভিভাবক গোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয় কারণ শিক্ষার্থীর সম্পূর্ণ বিকাশে অভিভাবকের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন অবশ্যই প্রয়োজন।

শিক্ষামানের সাথে বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্রশাসনিক সংস্থা যেমন শিক্ষা দপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রক, পর্ষদ, কাউন্সিল, বিশ্ববিদ্যালয় মান নির্ণয়কারী সংস্থা অর্থাৎ UGC, NAAC, NCTE ইত্যাদির সাথে যোগাযোগ রাখতে হয়। এই যোগাযোগ ঠিক রাখা এবং যোগাযোগে কোন বাধা না আসে তা দেখাও শিক্ষা প্রশাসকের দায়িত্ব।

অতএব উপরের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় শিক্ষা প্রশাসন ও শিক্ষা তত্ত্বাবধান দুই প্রক্রিয়া একে অপরের পরিপূরক। সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা সাফল্য ও উন্নতি নির্ভর করে এই দুই ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থার দক্ষতা ও বিচক্ষণতার উপর।

৬.৫ শিক্ষা ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা (Role of Teachers in different Areas of Educational Management)

যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থার চূড়ান্ত সার্থকতা শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে শিক্ষকদের উপর। উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা। পরিকল্পনা ও সম্পদ থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র শিক্ষকদের নেতিবাচক ভূমিকার জন্যই সবকিছু ব্যর্থ হতে পারে।

বিপরীতক্রমে, শিক্ষকরা শিল্পসংস্থার কর্মী নন, তাঁদের ব্যক্তিগত দক্ষতা কর্মক্ষমতা, উৎসাহ, সহযোগিতা, শিক্ষা পরিকল্পনার সার্থকতা অর্জনে এক অতি প্রয়োজনীয় সম্পদ। সেজন্য শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় শিক্ষকদের ভূমিকার কথা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিশেষভাবে দুটি ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৬.৫.১ শিখন-শিক্ষণের ক্ষেত্রে (Teaching-Learning Process)

শিক্ষা-ব্যবস্থাপনার অঙ্গ হিসাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য আয়োজন, যেমন, পরীক্ষণাগার, শিক্ষা সহায়ক উপকরণ, পাঠাগার, শ্রেণী কক্ষের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সবকিছুই শিক্ষকের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীন থাকে। শিক্ষণ পদ্ধতি, শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়ার উপযোগী পাঠদান, শ্রেণী কক্ষের অন্যান্য কাজ, মূল্যায়ন সংক্রান্ত সমস্ত দায়িত্ব শিক্ষকের উপর প্রধানতঃ ন্যস্ত থাকে। সুতরাং, শিক্ষককে একদিকে যেমন তার নিজের দক্ষতাকে সর্বদাই পরিশীলিত করার চেষ্টা করতে হয়, তেমনি, শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মূল নীতিগুলি সম্বন্ধেও তাকে অবহিত থাকতে হয়। অর্থাৎ শিক্ষক ও শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সংযোগ না থাকলে ব্যবস্থাপনা তথা শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না। যেমন, প্রশাসনিক পর্যায়ে কোন, বিশেষ নীতি গৃহীত হওয়ার পর শিক্ষকরা যদি তার তাৎপর্য সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকেন তবে কখনই ঐ নীতি কার্যকর করা যাবে না। অপরদিকে, শিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করা একমাত্র শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব নয়। সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা এর জন্য বহুলাংশে দায়ী। সুতরাং, শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধন এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মধ্যে শিক্ষকরাই হলেন সংযোগ সেতু।

৬.৫.২ সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে (In the Perspective of Social Responsibility)

শিক্ষার সঙ্গে এবং সেই কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক এতই ব্যাপক যে শিক্ষাবিদ্‌রা সমাজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রায় অভিন্ন বলে মনে করেন। সমাজের চাহিদা ও ব্যক্তির চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান শিক্ষার লক্ষ্যপূরণের অন্যতম শর্ত। শিক্ষকদের পক্ষেই সম্ভব এই দ্বিবিধ চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্য করা। অন্যদিকে জীবিকা হিসাবে শিক্ষকতা এমন একটি বৃত্তি যা অর্থনৈতিক, মানসিক ও আত্ম প্রতিষ্ঠার দিক থেকে সমাজের কাছে পরিপূর্ণভাবে ঋণী। এই জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাপনার চূড়ান্ত রূপায়ণ শিক্ষকদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। গৃহীত নীতি কার্যকর করা, প্রশাসনিক দায়িত্বপালন এবং সমাজ ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করার জন্য শিক্ষকরা দায়বদ্ধ। আর সামাজিক দায়বদ্ধতা সচেতন থাকলে তবেই ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সামাজিক সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব।

৬.৬ সারসংক্ষেপ (Summary)

ব্যবস্থাপনার প্রধান দুটি উদ্দেশ্য হল উৎকৃষ্ট ও সর্বোচ্চ উৎপাদন এবং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন। ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিকল্পনা করা, সংগঠন করা, কর্মী নিয়োগ ও পরিচালনা করা, নিয়ন্ত্রণ, সম্পদের সদ্ব্যবহার ও বিকাশ ইত্যাদি কাজগুলি সম্পন্ন হয়। এছাড়াও, জ্ঞানমূলক বিশ্লেষণাত্মক ক্ষমতার

বিকাশ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সংহতি ও সমন্বয় সাধন, উপযুক্ত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা এই সবই ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা সংজ্ঞায় উপরোক্ত বিষয়গুলি নানাভাবে ব্যবহৃত হয়েছে Koontz বলেছেন, ব্যবস্থাপনা মানবিক বিকাশ ঘটিয়ে সৃজনাত্মক কাজের মধ্যে দিয়ে সম্পদ সৃষ্টি ও সংগঠনকে উদ্দেশ্যমুখী করে সচল রাখে। ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক ও প্রয়োগমূলক এই দুই ধরনের প্রকারভেদ করা হয়। কারণ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী হলেও, প্রশাসন প্রধানতঃ নীতি নির্ধারক এবং ব্যবস্থাপনা ঐ নীতিকে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করার কাজে নিয়োজিত থাকে। প্রশাসনিক কাজগুলি হল, পরিকল্পনা। সংগঠন, কর্মীনিয়োগ, নেতৃত্বদান, প্রেষণা সৃষ্টি, নিয়ন্ত্রণ রক্ষা এবং সমন্বয় ও সংহতি সাধন। ব্যবস্থাপনার এইসব বৈশিষ্ট্য ও নিয়মাবলী শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলে তাকেই বলা হয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা। সেদিক থেকে শিক্ষা প্রশাসকের কাজ হল, শিক্ষার জন্য সম্পদ সৃষ্টি ও সদ্ব্যবহার পরিকল্পনা ও নীতি স্থির করা, আর্থিক অনুদান সংগ্রহ ও ব্যবহার, শিখন ব্যবস্থা পরিচালনা করা ও সচল রাখা, শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পরিস্থিতি বজায় রাখা, শিক্ষক নিয়োগ করা ইত্যাদি। এছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা ব্যবস্থা দুই-ই সামাজিক পটভূমিতে কাজ করে এবং সেজন্য বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে সংযোগ রাখাও, শিক্ষা প্রশাসনের প্রধান কাজ।

শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সার্থক করার জন্য শিক্ষকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানতম কাজ শিখন শিক্ষণ ব্যবস্থাকে সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যাওয়া এবং তার মূল দায়িত্ব শিক্ষকের। সমস্ত শিক্ষকই সমাজের কাছে দায়বদ্ধ।

৬.৭ প্রশ্নাবলী (Questions)

(১) ব্যবস্থাপনার ধারণা দিন। ব্যবস্থাপনার সাথে প্রশাসনের সম্পর্ক আলোচনা করুন।

(২) ব্যবস্থাপনার কার্যাবলীগুলি কি কি? সাধারণ ব্যবস্থাপনার কাজগুলি কিভাবে শিক্ষায় প্রয়োগ করা যায়?

(৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজগুলি বর্ণনা করুন।

(৪) সংক্ষীপ্ত টীকা লিখুন।

(ক) ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষকের ভূমিকা, (খ) প্রশাসনের সামাজিক দায়িত্ব, (গ) নিয়ন্ত্রণের প্রশাসনিক গুরুত্ব।

(ঘ) কর্মী নিয়োগ ও কর্মীর পেশাগত যোগ্যতা বৃদ্ধিতে প্রশাসনের ভূমিকা।

(৫) শিক্ষক কিভাবে প্রশাসকের ভূমিকা পালন করেন তা আলোচনা করুন।

একক ৭ ❑ শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্ব (Leadership in Educational Management)

গঠন (Structure)

প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

৭.১ শিক্ষা প্রশাসনে নেতৃত্ব

৭.২ নেতৃত্বের সংজ্ঞা

৭.৩ ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্বের কাজ

৭.৩.১ নির্দেশনা দান

৭.৩.২ অবেক্ষণ

৭.৩.৩ যোগাযোগ

৭.৩.৪ নিয়ন্ত্রণ

৭.৩.৫ সংহতি

৭.৪ দক্ষ নেতৃত্বের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

৭.৫ নেতৃত্বের তত্ত্ব ও শৈলী

৭.৫.১ নেতৃত্বের শৈলী

৭.৫.১.১ স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব শৈলী

৭.৫.১.২ গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব শৈলী

৭.৫.১.৩ স্বতঃনিয়ন্ত্রিত নেতৃত্ব শৈলী

৭.৫.২ নেতৃত্বের তত্ত্ব

৭.৫.২.১ নেতৃত্বের আচরণবাদী তত্ত্ব

৭.৫.২.২ নেতৃত্বের সংলক্ষণ তত্ত্ব

৭.৫.২.৩ পরিস্থিতি অনুযায়ী নেতৃত্বের তত্ত্ব

৭.৬ ব্যবস্থাপক ও প্রেষণা সৃষ্টিকারী হিসাবে নেতা

৭.৭ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী নেতা

৭.৮ সারসংক্ষেপ

৭.৯ প্রশ্নাবলী

প্রস্তাবনা (Introduction)

সুদক্ষ নেতৃত্ব ব্যবস্থাপনার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ সঠিক নেতৃত্বই ব্যবস্থাপনাকে কার্যকরী করে তোলে। নেতৃত্বের প্রকাশ হয় বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে যেমন নির্দেশনা অবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ, যোগাযোগ রক্ষা করা ইত্যাদি ব্যাপারগুলো সম্বন্ধে না জানা থাকলে ব্যবস্থাপনার এর ধারণা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এছাড়া নেতৃত্বের স্বরূপ সঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্য নেতৃত্বের বিভিন্ন তত্ত্ব ও সুদক্ষ নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জ্ঞান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সব শেষে নেতা কিভাবে দলকে পরিচালনা করেন, দলে প্রেষণার সৃষ্টি করেন ও ঠিক মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন—এই বিষয়বস্তুগুলি শিক্ষা প্রশাসনের শিক্ষার্থীর অবশ্যই জানা দরকার।

উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্বের ভূমিকা সম্বন্ধে ধারণা দিতে পারবেন।
- শিক্ষা ব্যবস্থাপনাকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে অবহিত হবেন।
- নেতৃত্বের তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- দলের পরিচালক ও প্রেষণা সৃষ্টিকারী নেতৃত্বের ভূমিকা বলতে পারবেন।
- নেতার পক্ষে ফলপ্রসূ সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জানতে পারবেন।

৭.১ শিক্ষা প্রশাসনে নেতৃত্ব (Leadership in Educational Management)

সাধারণভাবে বলা যায় নেতা হলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি সংস্থাকে সংগঠিত করেন। দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দেন, তাদের উদ্যোগী করে তোলেন এবং সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ করে তার অগ্রগতি সুনিশ্চিত করে তোলেন।

নেতৃত্বের ব্যাখ্যা করা যায় দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে—

এক, নেতৃত্ব এমন এক প্রক্রিয়া যা অন্যের আচরণের উপর প্রভাব ফেলে।

দুই, পরিস্থিতি অনুযায়ী লক্ষ্যাভিমুখী কাজে দলের মধ্যে প্রেষণার সৃষ্টি করে।

শিক্ষা প্রশাসনে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে থাকেন শিক্ষা আধিকারিক, শিক্ষা অবেক্ষক (Supervisor) শিক্ষালয়ের প্রধান, পরিচালন সমিতি এমন কি সাধারণ শিক্ষক যিনি শ্রেণীকক্ষে নেতার ভূমিকা পালন করেন। এরা সবাই পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন পদে আসীন হয়ে শিক্ষার উদ্দেশ্যের সার্থক রূপায়ণে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন।

৭.২ নেতৃত্বের সংজ্ঞা (Definition of Leadership)

শিক্ষার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রসঙ্গে পরবর্তী আলোচনার পূর্বে প্রথমেই জানা দরকার নেতৃত্ব কাকে বলে। অনেক বিষয়ের মতই নেতৃত্ব শব্দটা আমরা যত সহজে উচ্চারণ করি বা বুঝতে পারি তত সহজে এর সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। অন্যের আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করা বা কোন লক্ষ্য অর্জনে দলকে উদ্বুদ্ধ করা নেতার কাজ হলেও, এইটুকুই নেতৃত্বের সংজ্ঞা স্থির করার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

Keith Davis-এর মতে,

Leadership is the process of encouraging and helping others to work enthresiastically towards objectives (নেতৃত্ব হচ্ছে সেই প্রক্রিয়া যা উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অন্যদের উৎসাহিত হতে সাহায্য করে)।

এই সরল সংজ্ঞায় নেতৃত্ব সম্বন্ধে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের চেয়ে অন্যদের প্রেরণা ও উৎসাহ দেওয়ার কথাই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু P. Drucker আরও বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে নেতৃত্বের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে,

Leadership is the process of lifting of mans vision to higher sights, raising of man's performance to higher standard, building of man's personality beyond his normal limitations (নেতৃত্ব মানুষের নজর উঁচু করে, তার কাজকে উন্নততর মানে পৌঁছে দেয়, মানুষের স্বাভাবিক ক্ষমতার সীমা ছাড়িয়ে তার ব্যক্তিত্ব গঠন করে দেয়)। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে পূববর্তী সংজ্ঞায় যেখানে কোন একটি লক্ষ্যপূরণের মধ্যেই নেতৃত্বের কাজ সীমাবদ্ধ থাকার কথা বলা হয়েছে। সেখানে দ্বিতীয় সংজ্ঞায় বলা হয়েছে কর্মীদলের মধ্যে স্থায়ী পরিবর্তনের কথা, যা পরবর্তী পর্যায়ে আরও উচ্চতর লক্ষ্য অর্জনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। বলা বাহুল্য শিক্ষায় দ্বিতীয় প্রকার নেতৃত্বই উপযুক্ত এবং সেজন্য দ্বিতীয় সংজ্ঞাটি গ্রহণযোগ্য।

৭.৩ ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্বের কাজ (Leadership Activities in Management)

নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয় বিভিন্ন ধরনের প্রশাসনিক কাজকর্মের মাধ্যমে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা শিক্ষা দপ্তরের অন্তর্গত প্রশাসনিক কাজকর্মগুলি হল বহুমুখী, যার একটি হল নির্দেশনা দান (Guidance)।

৭.৩.১ নির্দেশনা দান (Guidance)

নির্দেশনা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যা লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা থেকে শুরু করে সেই লক্ষ্য অর্জন করা পর্যন্ত ধাপে ধাপে একটি সহায়ক কার্যক্রমের পরিকল্পনা রচনা করে। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বা বৃহত্তর ক্ষেত্রে একটি শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য কি হবে, কি কি পদ্ধতি ও সহায়ক উপকরণ বা ব্যবস্থা দরকার, কোন পদ্ধতিতে কম সময়, অর্থ এবং শক্তি ব্যয় করে লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে, সাফল্যের মূল্যায়ন কিভাবে হবে এবং তার ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে। এসবই নির্দেশনার অন্তর্গত। একজন সফল নেতা তার দলের কর্মীদের কাজের লক্ষ্যমাত্রা স্থির

করতে সাহায্য করেন এবং উপরোক্ত সব কয়টি ধাপ অতিক্রম করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সাহায্য নির্দেশ এবং ক্ষেত্র বিশেষে আদেশ দিয়ে থাকেন।

বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য, সরকারি পর্যায়ে শিক্ষা প্রশাসক, মন্ত্রী, শিক্ষা বোর্ডের সভাপতি, যে কেউই তাঁদের নিজস্ব ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে পারেন এবং তাঁর সহযোগী ও অধীনস্থ দলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দান করতে পারেন। সুদক্ষ নির্দেশনা যেমন প্রশাসককে সকলের কাছে একজন নেতা হিসাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলে তেমনি প্রতিষ্ঠানের সাফল্য ও অসাফল্য নির্ভর করে উপযুক্ত নির্দেশনার উপর।

৭.৩.২ অবেক্ষণ (Supervision)

নেতৃত্বের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল অবেক্ষণ বা তত্ত্বাবধান (Supervision) তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়া কেমন হবে তা নির্ভর করে নেতৃত্ব শৈলীর (Style of Leadership) উপর। এই বিষয়টি অন্য একটি অংশে আলোচনা করা হবে। কিন্তু সাধারণভাবে নির্দেশনা দান করার পর একটি পর্যায়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে কিনা, কি কি সমস্যা দেখা দিচ্ছে, সমস্যাগুলির সমাধান কিভাবে হওয়া সম্ভব এই সব বিষয়গুলির প্রতি নজর রাখা এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য দেওয়ার নামই হল তত্ত্বাবধান। একজন নেতা, একজন সুদক্ষ তত্ত্বাবধায়কও বটে। তত্ত্বাবধান কথার অর্থ অযথা কর্মীদের কাজে হস্তক্ষেপ বা সমালোচনা করা নয়। প্রয়োজন মত সাহায্য দান করা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে লক্ষ্যপূরণের জন্য তত্ত্বাবধান একান্ত আবশ্যক। যেমন, কোন বিষয় পড়াতে গিয়ে শিক্ষকরা কি কি বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন, তার প্রতিকার কিভাবে হতে পারে, কি কি আয়োজন দরকার। এই সব বিষয়ে নজর না রাখলে শেষপর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফলাফল খারাপ হতে পারে সুনাম নষ্ট হতে পারে।

৭.৩.৩ যোগাযোগ (Communication)

একজন দক্ষ নেতার পক্ষে প্রতিষ্ঠানের সকলের সঙ্গে যোগাযোগ থাকা একান্ত আবশ্যক অর্থাৎ যোগাযোগ রক্ষাকারী না হলে প্রশাসনিক নেতা হওয়া যায় না। যোগাযোগ (Communication) এমন একটি প্রক্রিয়া যা একজনের নিকট থেকে অন্য একজনের কাছে তথ্য পৌঁছে দেয়। নেতা হিসাবে একজন শিক্ষা প্রশাসক যত স্পষ্টভাবে কোন কার্যক্রমের উদ্দেশ্য (objective) অন্যদের কাছে তুলে ধরতে পারবেন এবং অন্যদের প্রেরিত তথ্য সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারবেন তার উপর কার্যক্রমটির সাফল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল। যোগাযোগের মধ্যে বা বোঝাপড়ার মধ্যে ফাঁক (Communication gap) বহু কার্যক্রমের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। নির্দেশনা এবং অবেক্ষণ বহুলাংশে উপযুক্ত যোগাযোগের উপর নির্ভরশীল। যোগাযোগের পদ্ধতি লিখিত, মৌখিক, এবং প্রক্রিয়া একমুখী, বহুমুখী, দ্বিমুখী ইত্যাদি নানা রকম হতে পারে। তত্ত্বাবধান অনেকটাই যোগাযোগ নির্ভর।

৭.৩.৪ নিয়ন্ত্রণ (Control)

নির্দেশনা, অবেক্ষণ ইত্যাদি প্রশাসনিক কাজগুলির আর একটি উদ্দেশ্য হল প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ (Control) বজায় রাখা। নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির অর্থ হল প্রতিষ্ঠানের সব রকম সম্পদকে যথাযোগ্য কাজে লাগিয়ে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য পূরণ করা। নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য প্রতিষ্ঠানটির পারদর্শিতা বা কাজের মানকে কোন আদর্শ মান বা পারদর্শিতার নিদর্শনের সাথে তুলনা করা। এই পারদর্শিতার মান অর্থাৎ উৎকর্ষ (quality) বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন সুদক্ষ নেতৃত্বের।

৭.৩.৫ সংহতি (Coordination)

প্রশাসনিক নেতৃত্বের আর একটি কাজ প্রতিষ্ঠানের সমস্ত অংশের ক্রিয়াকলাপের সংহতি (Coordination) বজায় রাখা। কারণ প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কাজের সাফল্য নির্ভর করে উপযুক্ত সংহতি সাধনের উপর। সুদক্ষ নেতৃত্বের সাথে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজকর্ম কিভাবে জড়িত তা নিচের লেখচিত্রের সাহায্যে দেখানো হল।

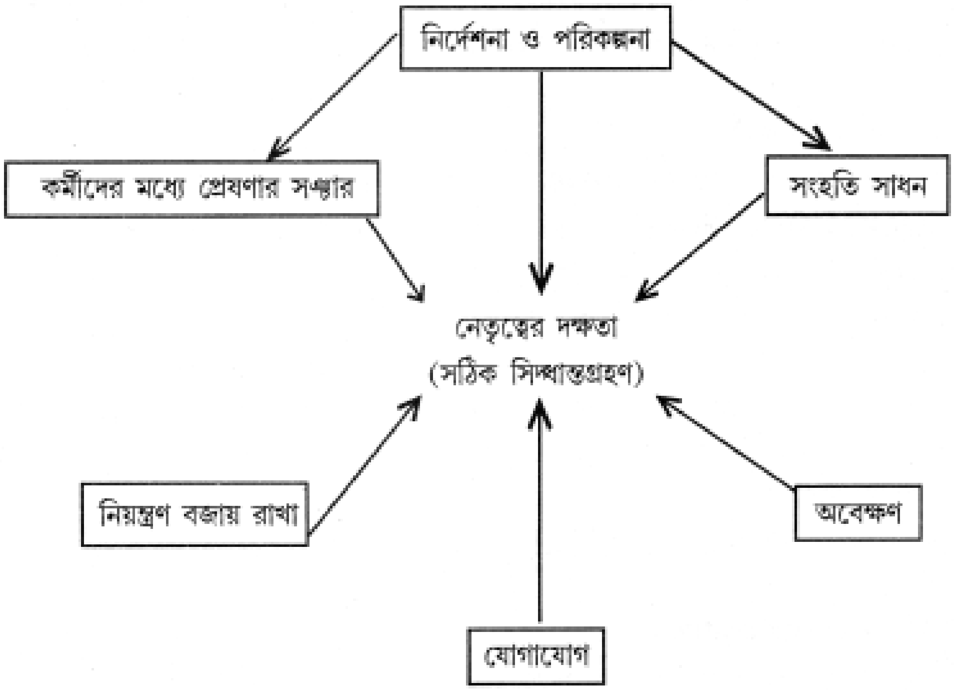

চিত্র ৭.১ : নেতৃত্বের বিভিন্ন কাজ ও তাদের সম্পর্ক

৭.৪ দক্ষ নেতৃত্বের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (Characteristics of an Effective Leader)

একজন সুদক্ষ নেতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি তা আলোচনা করতে গিয়ে S. Kirkpatrick ও E.A. Locke (1991) নিম্নলিখিত গুণগুলির কথা বলেন—

(ক) **উদ্যম** (Drive) : নেতার মধ্যে পারদর্শিতার চাহিদা, পরিচালনা করার, এগিয়ে যাওয়ার বাসনা, দায়িত্ব নেওয়ার ইচ্ছা দেখা যায়। তাই সুদক্ষ নেতা হলেন উদ্যমী ও উৎসাহী।

(খ) **নেতৃত্বদানের ইচ্ছা** (Will to Leadership) : যিনি নেতৃত্বের পরিচয় দেন তার মধ্যে নেতা হবার ইচ্ছা ক্ষমতা ও প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

(গ) **সততা** (Houesty) : একজন সুদক্ষ নেতা সাধারণতঃ সৎ এবং ন্যায়পরায়ণ হন।

(ঘ) **বিশ্বাসযোগ্যতা ও আত্মবিশ্বাস** (Trustworthiness and Self Confidence) : সহযোগী কর্মীদের কাছে তিনি ভরসার পাত্র এবং কর্মীরা তাঁকে আত্মবিশ্বাসী মনে করেন।

(ঙ) **বুদ্ধি** (Intelligence) : নেতৃত্বের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ। বুদ্ধির দ্বারাই একজন সুযোগ্য নেতা তথ্য আরোহন করেন, সঠিক বিশ্লেষণ করেন, ব্যাখ্যা করেন এবং সবশেষে সমস্যা সমাধান করে সঠিক সিদ্ধান্ত নেন।

(চ) **জ্ঞান** (Knowledge) : সুদক্ষ নেতার আর একটি গুণ হল নিজস্ব পেশা সংক্রান্ত গভীর জ্ঞান। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষা প্রশাসক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের শিক্ষণ ও শিখন সম্পর্কে আধুনিক ধারণা ও গভীর অনুভূতি না থাকলে তিনি সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারেন না।

(ছ) **ব্যক্তিত্ব** (Personality) : সবশেষে বলা যায় এক যোগ্য নেতার ব্যক্তিত্ব হল বর্হিমুখী (Extravert) এই ধরণের নেতারা প্রাণোজ্জ্বল, সামাজিক চেতনা সম্পন্ন এবং নিজের অধিকার ও মতামতকে তুলে ধরতে দ্বিধা করেন না।

৭.৫ নেতৃত্বের তত্ত্ব ও শৈলী (Theories and styles of Leadership)

নেতৃত্বের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলি আলোচনা করার জন্য ও ব্যাখ্যা করার জন্য বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে নেতৃত্বের তত্ত্বের বিশ্লেষণ করেছেন। তবে নেতৃত্বের তত্ত্ব বর্ণনা করার আগে জানা প্রয়োজন নেতৃত্বের শৈলী (Style) সম্বন্ধে।

৭.৫.১ নেতৃত্বের শৈলী (Styles of Leadership)

নেতৃত্বের শৈলী বলতে বোঝানো হয় যে একজন নেতার আচরণের মধ্যে দিয়ে কোন ধরণের মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি নেতা হিসাবে আলাদা রকম ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়ে থাকেন। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি, কার্যকৌশল, দলীয় কর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক ও যোগাযোগ পদ্ধতি আলাদা। প্রতিষ্ঠান ভেদে তাদের সাফল্য ও ব্যর্থতাও একরকম নয়। এই সব বৈশিষ্ট্য মিলিতভাবে এক এক ধরণের নেতৃত্বের কৌশল সৃষ্টি করে। নেতাদের এই স্বকীয় কার্যকৌশলকেই বলা হয় নেতৃত্বের শৈলী (Leadership style)। এই প্রসঙ্গে তিন ধরনের শৈলীর কথা বলা যায় যেমন—

স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব শৈলী (autocratic style)

গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব শৈলী (democratic style)

স্বতঃনিয়ন্ত্রিত নেতৃত্বের শৈলী (Laissez-faire style)

৭.৫.১.১.১ স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব শৈলী (Autocratic Leadership Style)

স্বৈরচারী নেতৃত্বের শৈলীর বৈশিষ্ট্য হল নিম্নমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা। এই ধরনের নেতৃত্বে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়। যেমন—

—নেতা অধস্তন কর্মচারীদের আদেশ দেন কিন্তু তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেন না।

—নেতাই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। প্রয়োজনে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না করে সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য চাপ দেন। পরিবর্তনের সিদ্ধান্তও নেতার নিজস্ব।

—যোগাযোগ ব্যবস্থা একমুখী (Ove-way) অর্থাৎ নেতা থেকে অধঃস্তন ব্যক্তিরা।

—আদেশ পালনই সংগঠনের মূল লক্ষ্য, আদেশের তাৎপর্য বা কারণ বোঝার প্রয়োজন নেই।

—নেতিবাচক প্ররোচকের ব্যবহার অর্থাৎ শাস্তির ভয় সকলকে কর্মে নিয়োজিত থাকতে বাধ্য করে।

—কঠোর পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বহাল রাখা হয়। পরিদর্শনের উদ্দেশ্য আদেশ পালনে শৈথিল্য বা ত্রুটি অন্বেষণ।

— 'I' Style বা অহং শৈলীর প্রভাব। অর্থাৎ আমি যা বলছি তা ভ্রান্ত ও অবশ্য পালনীয়।

নীচের চিত্রের সাহায্যে এই ধরনের নেতৃত্বের ব্যাখ্যা করা যায়।

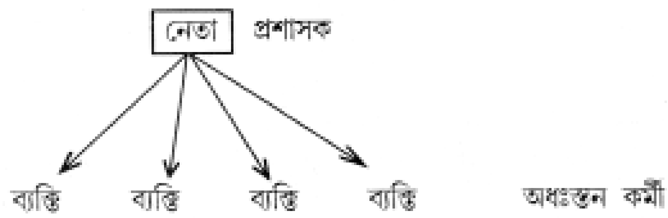

চিত্র ৭.২ : স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব শৈলী

স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্বের ফলে অনেক সময় কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা যায়। নেতার অনমনীয় মনোভাবের ফলে কর্মীদের কাজে অনীহা দেখা দিতে পারে। তবে স্বৈরাচারী নেতা যদি সদাশয় (Benevolent) স্বৈরাচারী নেতা হন তাহলে কর্মীদেরও সংগঠনের ভালো মন্দের ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি দেন। তাছাড়া সংগঠনের আকস্মিক কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়। স্বৈরাচারী নেতা যদি জ্ঞানী ও সুবিবেচনা হন তাহলে প্রতিষ্ঠানের উন্নতি হন।

৭.৫.১.২ **গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব শৈলী** (Democratic Leadership Style)

এই ধরনের নেতৃত্বে নেতা দলের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে, তাদের থেকে চিন্তা ভাবনা গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ—

— নেতা ও কর্মীর মধ্যে চিন্তাভাবনার আদান-প্রদান ও দ্বিমুখী যোগাযোগ (Two-way communication) অর্থাৎ নিম্নমুখী ও উর্ধ্বমুখী (Downward and upward) উভয় প্রকার, যোগাযোগই সক্রিয় থাকে।

— অংশগ্রহণ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

— কর্মীদের মধ্যে আত্মতুষ্টি, উৎসাহ, নতুন কিছু করার ইচ্ছা দেখা যায়।

— সৃজনশীলতার ঠিকানা ও প্রকাশের সম্ভাবনা থাকে।

— মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে।

— 'We' Style বা 'আমরা সবাই একসাথে' এই ধরনের মনোভাব প্রেষণাকে সক্রিয় রাখে।

৭.৩ নং চিত্রে গণতান্ত্রিক নেতৃত্বশৈলীর ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতি বোঝানো হয়েছে।

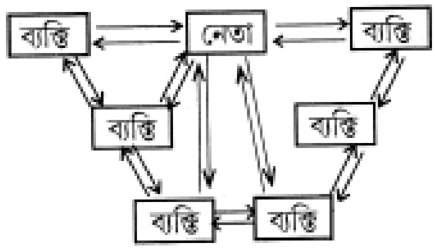

চিত্র ৭.৩ : গণতান্ত্রিক নেতৃত্বশৈলীর পারস্পরিক সম্পর্ক

৭.৫.১.৩ স্বতঃনিয়ন্ত্রিত নেতৃত্ব শৈলী (Leissez-faire Leadership Style)

এখানে প্রথা অনুযায়ী বিধিবদ্ধ নেতৃত্ব অনুপস্থিত। নেতা নিজে অনেকাংশে নিষ্ক্রিয় থাকেন। এর ফলে কোন পূর্বনির্দিষ্ট যোগাযোগ প্রক্রিয়া দেখা যায় না। গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তিই তার মতামত জানাতে পারেন কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা নেতাকে বা নেতার মাধ্যমে অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। অর্থাৎ মূল নিয়ন্ত্রণ থাকে নেতার হাতে। কিন্তু স্বতঃনিয়ন্ত্রিত নেতৃত্বের বেলায় যে কোন কর্মী অন্যকর্মীর সঙ্গো মতবিনিময় করতে পারেন, বিতর্কে জড়াতে পারেন বা সরাসরি অন্যের মত খারিজ বা গ্রহণ করতে পারেন।

— ব্যক্তির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, মতপ্রকাশ, গ্রহণ বা বর্জন সব ক্ষেত্রেই।

— নেতা শুধু প্রয়োজনেই নেতৃত্ব দেন, অর্থাৎ তিনি প্রয়োজনবোধ করলে তবেই নিজের সিদ্ধান্ত জানান।

— নেতার ভূমিকা শুধু তথ্য প্রচারের ক্ষেত্রে।

— নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়ন প্রায় অনুপস্থিত। অর্থাৎ মতবিরোধের ক্ষেত্রে, সময় ও শ্রমের অপচয় হলেও তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করেন না। ভালোমন্দের দায়ও ব্যক্তিবিশেষের দলগত নয়, নেতারও নয়।

— ব্যক্তিগত দোষারোপের সম্ভাবনা প্রবল। সুফলভাগী সকলেই।

— 'You' Style অর্থাৎ প্রতিটি সদস্যের মূখ্যভূমিকা নীচের চিত্রে সাহায্যে এই শৈলীর ব্যাখ্যা করা যায়। এই ধরনের নেতৃত্ব তখনই সম্ভব যখন সদস্যরা সকলেই অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত।

স্বতঃনিয়ন্ত্রিত নেতৃত্বশৈলীতে পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ প্রক্রিয়া অনিশ্চিত এবং তাৎক্ষণিক। ৭.৪ নং চিত্রে বিষয়টি দেখানো হল।

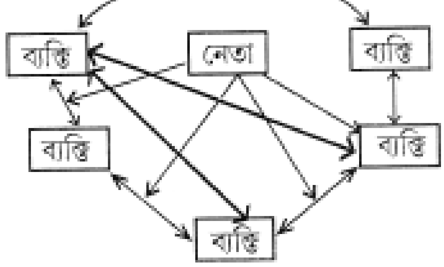

চিত্র ৭.৪ : স্বতঃনিয়ন্ত্রিত নেতৃত্ব শৈলীর পারস্পরিক সম্পর্ক

এই তিন ধরনের নেতৃত্ব অবশ্যই সম্পূর্ণ পৃথকভাবে কাজ করে না। অনেক সময় একই নেতা প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন শৈলী গ্রহণ করেন। তাই Tannerbaum ও Smidt (1973) নেতৃত্বের শৈলীকে তিনভাগে ভাগ না করে একটি

অনুচ্ছেদ রেখার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন। রেখার দুই চরম সীমা হল নেতাকেন্দ্রিক নেতৃত্ব ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক নেতৃত্ব। তাঁদের মতটি দেখানো হল ৭.৫ নং চিত্রে।

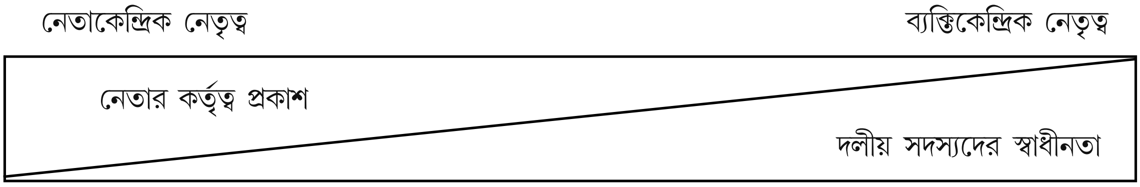

নেতাই নেতৃত্ব দেন	নেতা উৎসাহ দেন	নেতা সিদ্ধান্ত নেন কিন্তু দলের লোকের মতামত চান	নেতা সিদ্ধান্ত নেন কিন্তু দরকার হলে সদস্যদের মত অনুযায়ী পরিবর্তন করেন	নেতা সমস্যার কথা বলেন পরামর্শ চান	দলের মতামত গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত	নেতা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেন

চিত্র ৭.৫ Tannerbaum ও Smidt-এর মতানুযায়ী নেতৃত্বের প্রকারভেদ

অতএব এই চিত্র অনুযায়ী তিনটি শৈলী তিনটি অনমনীয় ভাগে বিভক্ত নয়—প্রয়োজনমত নেতা তার নিজস্ব কর্ম পদ্ধতি বা আচরণের পরিবর্তন করেন।

৭.৫.২ নেতৃত্বের তত্ত্ব (Theories of Leadership)

নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা ও গবেষণা করা হয়েছে ও হচ্ছে। সমাজ বিজ্ঞানীরা জানতে চেষ্টা করছেন কি কি উপাদানের উপর সুদক্ষ নেতৃত্ব নির্ভর করে। অর্থাৎ নেতৃত্ব সম্বন্ধীয় তত্ত্বগুলি কি কি। এই প্রসঙ্গে বেশ কিছু মতবাদের প্রস্তাব করা হয়েছে। সাধারণ নেতৃত্বের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই বিভিন্ন মতাবাদগুলিকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এগুলি হল—

— আচরণবাদী তত্ত্ব (Beheviouristic Theory of Leadership)

— নেতৃত্বের সংলক্ষণ তত্ত্ব (Trait theory of leadership)

— পরিস্থিতি অনুযায়ী নেতৃত্বের তত্ত্ব (Contingency Theory of Leadership)

৭.৫.২.১ নেতৃত্বের আচরণবাদী তত্ত্ব (Behaviourstic Theory of Leadership)

এই তত্ত্ব অনুযায়ী মনে করা হয় যে বিশেষ আচরণগুলির দ্বারাই নেতা ও সাধারণ কর্মীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়।

এই প্রসঙ্গে প্রথম 1940 এর দশকে ohio state University তে গবেষকরা নেতাসুলভ মনোভাবের দুটি মাত্রার (dimension) কথা বলেন : নেতার নিজস্ব উদ্যম (Initialing Structure) অন্যর প্রতি বিবেচনা বোধ (Consideretion) নিজস্ব উদ্যম বলতে বোঝানো হয়েছে একজন নেতা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য

কিভাবে নিজের ভূমিকা ও অন্যান্য কর্মীর ভূমিকা নির্ধারণ করেন—এবং এই ভূমিকা তিনি প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম শুরু করার আগেই ভাবনা চিন্তা করে নেন। অর্থাৎ যিনি নেতা তাঁর একটা বৈশিষ্ট্য হল তিনি সংস্থার কাজে উদ্যোগী থাকেন, পরিকল্পনা করে আগেই ঠিক করে নেন কে কোন কাজটি করবে, কত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে, কাজের মান কি হবে ইত্যাদি। নেতৃত্বের এই মাত্রা পরিমাপযোগ্য এবং উদ্যমের পরিমাণ অনুযায়ী নেতা দুই চরম প্রান্তের মধ্যে যে কোন বিন্দুতে অবস্থান করতে পারেন।

বিবেচনাবোধ বলতে বোঝায় নেতা কতখানি বিবেচক অর্থাৎ কর্মক্ষেত্রে নেতা ও কর্মীর যে পারস্পরিক সম্পর্ক তা কতখানি বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও অধস্তন কর্মচারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুবিবেচক নেতা কর্মীদের নিজস্ব সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত থাকেন, বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব পোষণ করেন ও সকলকে সমকক্ষ বলে মনে করেন। এক্ষেত্রেও অবিবেচক বা শূন্য বিবেচক থেকে চূড়ান্ত বিবেচক এই মাত্রায় নেতার অবস্থান যে কোন বিন্দুতে হতে পারে। উদ্যম ও বিবেচনাবোধের ভিত্তিতে নেতৃত্বের ব্যাখ্যা ৭.৬ নং চিত্রে পরিষ্কার বোঝানো হয়েছে—

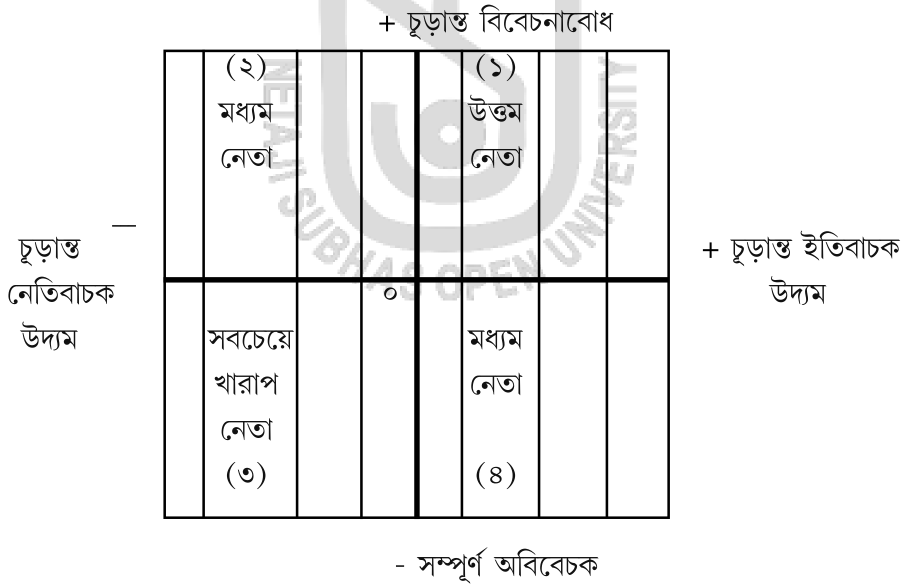

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

চিত্র ৭.৬ উদ্যম ও বিবেচনাবোধের ভিত্তিতে নেতৃত্বের ব্যাখ্যা এখানে দেখানো হয়েছে, প্রথম চতুর্থাংশে নেতার উদ্যম ও বিবেচনাবোধ দুই-ই প্রবল। এরা সবচেয়ে ভালো নেতা। বিপরীতক্রমে তৃতীয় চতুর্থাংশে দেখানো হয়েছে। নেতা অবিবেচক এবং নিরুদ্যম। এরা সবচেয়ে খারাপ নেতা। বাকী দুই অংশে যে কোন একটি গুণ বেশী অপরটি কম থাকায় এরা মধ্যম ধরনের নেতা হয়। University of Michigun Studies এ গবেষণা হয়েছে সেখানেও দুটি মাত্রার (dimensions) কথা বলা হয়েছে এগুলি হল কর্মীমুখী নেতৃত্বের আচরণ (Employee oriented) ও ফলাফলমুখী নেতৃত্বের আচরণ (Production oriented) কর্মীমুখী আচরণে পারস্পরিক সম্পর্ক ও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্রের উপর জোর দেওয়া হয়। ফলাফলমুখী আচরণে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যপূরণকেই সব থেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং মনে করা হয় কর্মীরা সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর মাধ্যম মাত্র।

এই দুই দৃষ্টিকোণ থেকে নেতৃত্বের ব্যাখ্যা করে R. Blake ও J. Mouton নেতৃত্বের গ্রীডের কথা বলেছেন। এই তত্ত্বটিকে ম্যানেজেরিয়াল গ্রীড (Managerial grid) বলে অভিহিত করা হয় (চিত্র ৭.৭)। এই গ্রীডের দুটি অক্ষ হল কর্মীকেন্দ্রিকতা (employee oriented) ও ফলাফল কেন্দ্রিকতা (Result oriented)।

দুটি অক্ষ বরাবর এই গ্রীডের ৯টি ঘর আছে এবং ৮১টি স্থান আছে। দুই দৃষ্টি কোণের পরিপ্রেক্ষিতে যে কোন ধরনের নেতৃত্বকে এই ৮১ স্থানের যে কোন জায়গায় ফেলা যায়। নিচে গ্রীডটির একটি লেখচিত্রের সাহায্যে দেখানো হচ্ছে (চিত্র ৭.৭)

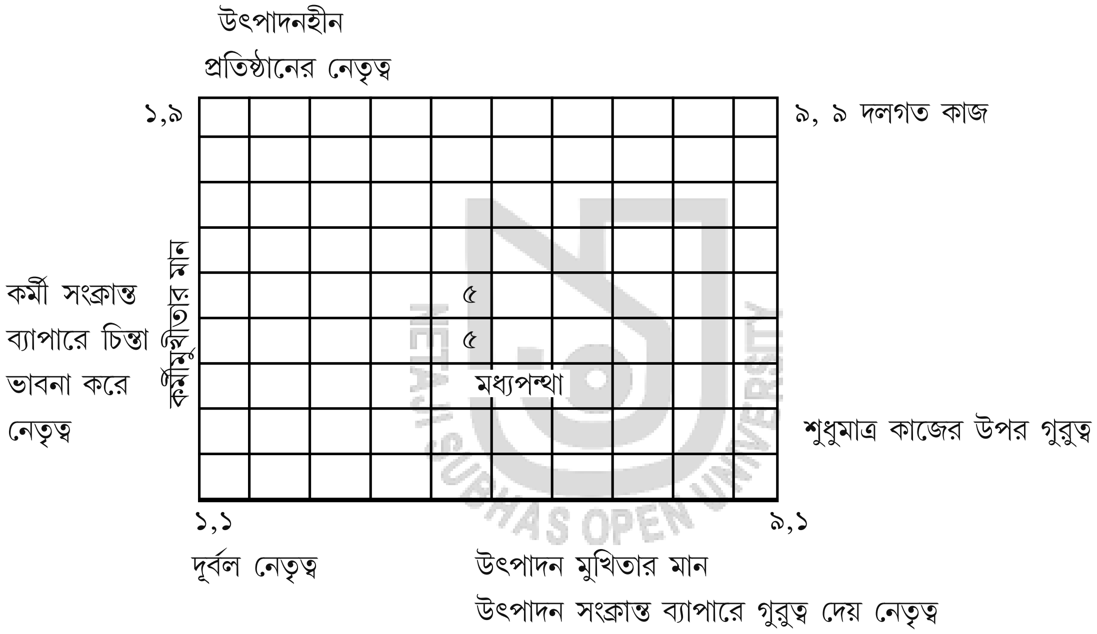

চিত্র ৭.৭ : কর্মীমুখী ও ফলাফলমুখী নেতৃত্ব

Blake ও Monton-এর মতে ৯, ৯ স্থান হচ্ছে নেতৃত্বের সর্বোৎকৃষ্ট স্থান। কারণ এখানে কর্মী ও উৎপাদন বা ফল দুই-এর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। অনুরূপ ভাবে ১, ১ স্থান হল সর্বাপেক্ষা দুর্বল নেতৃত্ব যেখানে কর্মী বা উৎপাদন কোনটাই দেখা হয় না। ৯, ১ স্থান শুধু ফলের কথা ভাবা হয় অর্থাৎ স্বৈরাচারী নেতৃত্ব এবং ১, ৯ হচ্ছে ক্লাবের (উৎপাদনহীন) নেতৃত্ব বা অবাধ নীতির নেতৃত্ব।

এই Matrix বা বর্গক্ষেত্র তৈরী করবার জন্য কোন সংস্থার কর্মীদের কিছু প্রশ্নগুচ্ছ দেওয়া হয়। এই প্রশ্নগুলি নেতার নেতৃত্বের ধরণ বিচার করার জন্য তৈরী করা হয়েছে। প্রশ্নের উত্তর অনুযায়ী এই নেতৃত্বকে ১ থেকে ৯-এর মধ্যে স্থান দেওয়া হয়। স্কোর অনুযায়ী গ্রীডের যেখানে যার স্থান নেতৃত্বের ধারাও সেরকম।

আচরণ সংক্রান্ত তত্ত্বের সাহায্যে নেতৃত্বের বর্ণনা যতটা দেওয়া যায় সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া ততটা সম্ভব হয় না। তাই নেতৃত্বের অন্যান্য তত্ত্বগুলিও জানা থাকা দরকার।

৭.৫.২.২ নেতৃত্বের সংলক্ষণ তত্ত্ব (Trait Theory of Leadership)

বহুদিন ধরেই নেতৃত্বের বর্ণনা দিতে গিয়ে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও সংলক্ষণ এই দুই-এর গুরুত্ব দেওয়া হয়ে আসছে।

সুদক্ষ নেতৃত্বের সাথে দুর্বল নেতৃত্বের তুলনা করার সময় ব্যক্তির দৈহিক বৈশিষ্ট্য সামাজিক ও মানসিক সংলক্ষণ ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি উপাদানের সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে। মনোবিজ্ঞানীরা প্রায় ২০টি গবেষণার সাহায্যে ৮০টি নেতৃত্বের সংলক্ষণ (Trait) সনাক্ত করেন। এই ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলো ৭.৪ উপ এককে সুদক্ষ নেতৃত্বের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করার সময় উল্লেখ করা হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে সংলক্ষণের তত্ত্বের মধ্যে অন্তর্গত করা যায়, তবে একথাও ঠিক যে এই সংলক্ষণগুলি থাকলে যে একজন ব্যক্তি নেতা হিসাবে সাফল্য লাভ করবে একথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। সংলক্ষণ তত্ত্বের ভিত্তি হল প্রচলিত মহৎব্যক্তিত্বের তত্ত্ব (Greatmen Theory)। অর্থাৎ নেতার মধ্যে কিছু নিজস্ব মহৎগুণ না থাকলে নেতা হওয়া যায় না। যে কোন মানুষই নেতা হতে পারে না। কিছুটা সহজাত এবং কিছুটা শিক্ষা পরিবেশ, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি থেকে অর্জিত গুণ থাকলে তবে দলের মধ্যে স্বাভাবিক নিয়মেই এরা নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান।

এই জাতীয় নেতারা অন্যকে অনুপ্রাণিত করতে পারেন, বহু মানুষকে স্বমতে নিয়ে আসতে পারেন এবং অনেক সময়ই মানুষের আশা-আকাঙ্খার প্রতীক হয়ে দাঁড়ান। সেইজন্য অনেক সময় এদের প্রেরণা দাতা নেতাও (Charismatic Leader) বলা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ জাতীয় নেতার কিছুটা স্বীকৃত কারণ অনেক সময় একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ তাঁর পান্ডিত্য, খ্যাতি, চারিত্রিক মাধুর্য ও অন্যান্য দৃষ্টান্তমূলক বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বের স্বাভাবিক দাবিদার হয়ে ওঠেন।

৭.৫.২.৩ **পরিস্থিতি অনুযায়ী নেতৃত্বের তত্ত্ব** (Contingency Theory of Leadership)

আচরণ সম্বন্ধীয় তত্ত্ব অথবা সংলক্ষণ সম্বন্ধীয় তত্ত্বের দ্বারা নেতৃত্বের সঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না। নেতৃত্ব অনেকাংশে নির্ভর কখন কি ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে একজন নেতাকে কাজ করতে হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে প্রথম দিকে নেতৃত্ব সম্বন্ধে F. Fiedler একটি মডেলের প্রস্তাব দেন। Fiedler নেতৃত্বের ধারণা গঠন করার জন্য একটি প্রশ্নগুচ্ছ তৈরী করেন সেটির নাম হল Least Preferred Coworker (LPC) Questionnaire LPC স্কোরের সাহায্যে Fiedler দেখেন যে বেশি স্কোর নেতৃত্বের পারস্পরিক সম্পর্ক জনিত উপাদানের সঙ্গে জড়িত আর কম স্কোর সাধারণতঃ উৎপাদন মুখী উপাদানের সঙ্গে সম্পর্কিত। Fiedler তাঁর মডেলে ৩টি Contingency variable বা পরিস্থিতিমূলক চলের কথা বলেন যেগুলি হল নেতা ও কর্মীর পারস্পরিক সম্পর্ক (Mutual Relation between dealer and worker) নেতা যদি অন্যান্যদের কাছে গ্রহণযোগ্য হন তবেই তিনি তাদের বিশ্বাস অর্জন করেন ও পারস্পরিক ও সংঘাতের সংখ্যাও কমে যায়।

দ্বিতীয়টি হল কাজের গঠন (task Structure) অর্থাৎ কর্মীর সম্পাদিত কাজ নিয়মমাফিক (Routine) না নতুন নতুন সমস্যাভিত্তিক (non routine) ।

তৃতীয়ত, নেতার স্থান ও ক্ষমতা (Status and power of the leader) অর্থাৎ নেতার পুরস্কার দেওয়ার ক্ষমতা অথবা আইনতঃ নেতার ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার কতখানি। এই মডেলে Fiedler ও তাঁর সহযোগী গবেষকরা আরও তিনটি নেতৃত্বের উপাদানের কথা বলেন। এগুলি হল—পরিস্থিতি কতখানি অনুকূল।

— নেতার মধ্যে সুদক্ষ নেতৃত্বের সংলক্ষণের উপস্থিতি

— এবং দলগত কাজে সফলতা।

এই তত্ত্ব অনুযায়ী একজন নেতার সাফল্য নির্ভর করে পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্যের উপর। তাই সংস্থার নেতার দক্ষতা বৃদ্ধি করা তখনই সম্ভব যখন সংস্থাতে পরিবেশ বা পরিস্থিতি অনুকূল থাকে। Fiedler-এর তত্ত্বটিও একটি চিত্রের (চিত্র ৭.৮) সাহয্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

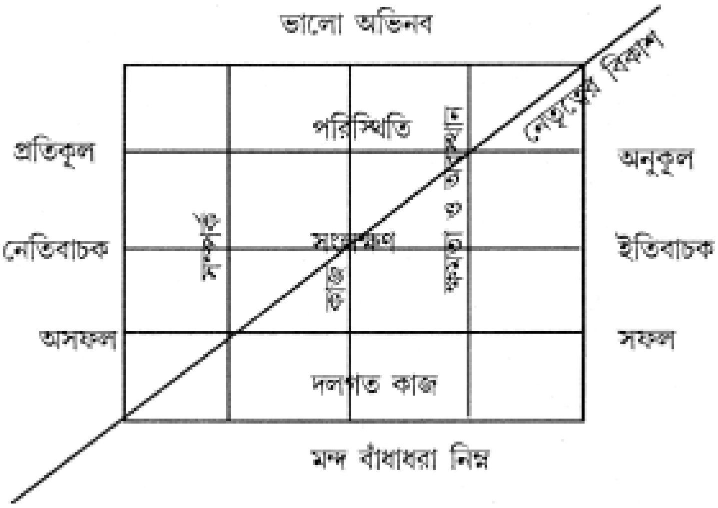

চিত্র ৭.৮ ফিডলারের তত্ত্বের নেতৃত্বের বিকাশ

এখানে দেখানো হয়েছে কর্মীদের সঙ্গো সুসম্পর্ক বজায় থাকলে, অভিনব কাজের সুযোগ উচ্চক্ষমতা ও প্রশাসনিক অবস্থান থাকলে এবং তার সঙ্গো অনুকূল পরিবেশ নেতৃত্বে সুলভ ইতিবাচক সংলক্ষণ ও দলগত কাজে সফলতা যুক্ত হলে নেতৃত্বের বিকাশ দ্রুততর হয়।

৭.৬ ব্যবস্থাপক ও প্রেষণা সৃষ্টিকারী হিসাবে নেতা (Leader as team manager and Motivatar)

আধুনিক পরিবর্তনশীল সমাজে নেতৃত্বের ধারণা আরও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যে কোন প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি বা উন্নতি অনেকাংশে নির্ভর করে দলগত কাজের সাফল্যের উপর (Team work) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই ধরনের দলীয় একতা ও সংহতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই নেতা হবেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি Team Manager বা দলকে সঙ্ঘবদ্ধ করে এগিয়ে নিয়ে যান। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের নেতৃত্বের প্রয়োজন যিনি দূর দৃষ্টি সম্পন্ন, জ্ঞানবিকাশে সাহায্যকারী ও পরিবর্তিত পারিপার্শিকের সাথে প্রতিষ্ঠানকে মানিয়ে নিয়ে তার অগ্রগতির সহায়ক হন। তাই বলা হয় যে Leader is a Visionary, a Change agent and knowledge manager দলীয় নেতার ভূমিকায় তিনি—

— প্রতিষ্ঠানের বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগ রাখেন।
— কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেন।
— অন্তর্দ্বন্দ্বের মীমাংসা করেন।
— সমস্যার সমাধান করেন।

প্রেষণা সৃষ্টিতেও নেতার ভূমিকা অনন্য। নেতার আচরণ কর্মীদের প্রতি তাঁর ব্যবহার এবং আরও অন্যান্য

উপাদান প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের প্রেষণায় প্রভাব ফেলে এবং প্রেষণা ছাড়া কোন কাজে সাফল্য সম্ভব নয়। সুদক্ষ ও সুবিবেচক নেতা বিভিন্ন ধরনের প্ররোচক প্রয়োগ করে প্রেষণার সৃষ্টি করেন। পূর্ববর্তী অংশে নেতৃত্বের তত্ত্বগুলিতেও নানাভাবে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৭.৭ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী নেতা (Effective Decision making by the Leader)

সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Decision making) কথাটির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, Decision making is the process of combining and integrating available information in order to choose one out of several possible cousses. (সিদ্ধান্ত গ্রহণ হল সমস্ত প্রাপ্ত তথ্যের সমাবেশ ও সমন্বয় করে একাধিক সম্ভাব্য উপায় বা পন্থার মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়ার প্রক্রিয়া)

সুদক্ষ নেতৃত্ব ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ—এই দুটি অবস্থা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ যখন সফল হয় তখন প্রতিষ্ঠানেরও উন্নতি দেখা যায়। সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ নির্ভর করে নিম্নলিখিত উপাদানের উপর—

— নেতা যখন প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের উপর দৃষ্টি দেন।

— যখন তাঁর সিদ্ধান্তগ্রহণ যুক্তিপূর্ণ।

— তিনি যখন বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও স্বজ্ঞামূলক চিন্তা প্রয়োগ করেন।

— নেতা যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলোর উপর দৃষ্টি দেন এবং সমস্ত তথ্যের যথাযথ সমন্বয় ঘটাতে পারেন।

— যখন তাঁর সিদ্ধান্ত বিশ্বাসযোগ্য, সহজ ও নমনীয়।

— যখন তিনি সমস্ত বিকল্প পন্থাগুলি গুরুত্ব সহকারে বিচার করে একটিকে বেছে নেন আজকের দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে নেতার দক্ষতা নির্ভর করে তৎপরতা, বিচক্ষণতার উপর এবং ঘটনার আকস্মিকতার সাথে মানিয়ে চলার ক্ষমতার উপর। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা শুধু প্রতিষ্ঠানের প্রধানের আছে তা নয়। প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত সব কর্মীরাই কোন না কোন সময়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন এবং সেই সব সিদ্ধান্তের বৈশিষ্ট্যের উপর কুশল নেতৃত্বের প্রতিফলন দেখা যায়। শক্তিশালী নেতৃত্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ভাবমূর্তি জনসমক্ষে প্রকাশ করতে পারে। এর সাথে অনাগত ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে শেখানো, স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করা এবং সমস্ত কাজকর্মকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করতে শেখানো দক্ষ নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য।

৭.৮ সারসংক্ষেপ (Summary)

ব্যবস্থাপনাকে সফল ও কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজন সুদক্ষ নেতৃত্বের। নেতৃত্ব যেমন দলীয় কর্মীদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে তেমনি তাদের মধ্যে প্রেষণার সৃষ্টি করে কাজে নিয়োজিত রাখতে পারে। নেতৃত্বের সংজ্ঞা যে দুটি বিষয় স্থান পেয়েছে তার মধ্যে আছে অন্যদের লক্ষ্য পূরণে উৎসাহী করা এবং তাদের দৃষ্টি ও দক্ষতাকে প্রত্যাশার ঊর্ধে উন্নীত করা। প্রশাসকের মত নেতৃত্বের কাজের মধ্যে অন্যতম হল, নির্দেশনা দান, অবেক্ষণ, যোগাযোগ, নিয়ন্ত্রণ ও সংহতি সাধন। নির্দেশনা দান প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্য অর্জনের জন্য কর্মীদের

সমস্যাগুলি বুঝে নিয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা দান। অবেক্ষণ হল, কাজের গতি ও ধারা বজায় রাখার জন্য তত্ত্বাবধান। যোগাযোগ হল নেতৃত্বে অন্যতম প্রধান শর্ত কারণ উপযুক্ত যোগাযোগ পরস্পর বোঝাপড়ার জন্য একান্ত আবশ্যক। সংহতি সাধন ও নিয়ন্ত্রণ ও লক্ষ্য পূরণের জন্য একান্ত আবশ্যক।

সুদক্ষ নেতৃত্বের কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। এর মধ্যে আছে উদ্যম, নেতৃত্বদানের ইচ্ছা, সততা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও আত্ম বিশ্বাস, বুদ্ধি, জ্ঞান ও ব্যক্তিত্ব। বিশেষজ্ঞরা তিন প্রকারের নেতৃত্ব শৈলীর কথা বলেছেন। স্বৈরতন্ত্রী নেতৃত্বের ক্ষেত্রে নেতা নিজেই সিদ্ধান্ত নেন, দলীয় কর্মীরা তা মানতে বাধ্য থাকেন। অন্যের মতামত শুনে তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন না। গণতান্ত্রিক নেতা সকলের মতামত শুনে সিদ্ধান্ত নেন, সিদ্ধান্তের কারণ ব্যাখ্যা করেন এবং প্রয়োজন হলে অন্যের মত শুনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। স্বতঃনিয়ন্ত্রিত নেতৃত্বের ক্ষেত্রে নেতা কোন সিদ্ধান্ত নেন না। সহজে নিজের মতামত ব্যক্ত করেন না। অন্যরা নিজেদের মত কাজ করে। এতে সকলের সঙ্গে সকলে স্বাধীনভাবে যোগাযোগ করতে পারে।

নেতৃত্বের তিনটি তত্ত্ব হল, আচরণবাদী তত্ত্ব, সংলক্ষণ তত্ত্ব এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী নেতৃত্বের তত্ত্ব। আচরণবাদী তত্ত্বে কর্মীমুখিতা ও উৎপাদন মুখিতা এই দুই মাত্রার মধ্যে তুলনামূলক অবস্থানের ভিত্তিতে নেতৃত্বের প্রকৃতি বিচার করা হয়। এই তত্ত্ব অনুযায়ী সর্বোৎকৃষ্ট নেতা কর্মীমুখী এবং উৎপাদনমুখী দুই-ই। নিকৃষ্ট নেতা তিনিই যিনি কর্মীমুখীও নন আবার উৎপাদনমুখীও নন। সংলক্ষণ তত্ত্ব অনুযায়ী নেতারা কিছু সহজাত ও অর্জিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হন। ঐ সংলক্ষণগুলি জানলেই নেতা নির্বাচন সম্ভব। আর পরিস্থিতি অনুযায়ী নেতৃত্বের ক্ষেত্রে, প্রতিকূল বা অনুকূল পরিস্থিতি, সংলক্ষণ ও দলগত কাজে সাফল্য এই তিনটি বিষয়ের উপর এবং পারস্পরিক সম্পর্ক, কর্মমুখিতা এবং ক্ষমতা এই বিষয়গুলির উপর নেতৃত্বের বিকাশ নির্ভর করে। সর্বোৎকৃষ্ট নেতৃত্ব তখনই সম্ভব যখন ব্যক্তি কর্মমুখী, ক্ষমতা সম্পন্ন ও কর্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে সক্ষম এবং সেই সঙ্গে অনুকূল পরিস্থিতি। উপযুক্ত ইতিবাচক সংলক্ষণ ও দলগত কাজে সাফল্য বেশি থাকে।

নেতা একজন সুদক্ষ দল পরিচালক ও প্রেষণা সৃষ্টিকারী এবং সেই সঙ্গে সময় মত সবচেয়ে কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম ব্যক্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৭.৯ প্রশ্নাবলী

(১) নেতৃত্বের ধারণা দিন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্বের প্রকাশ কিভাবে হয়?

(২) দক্ষ নেতৃত্বের বর্ণনা দিন।

(৩) নেতৃত্ব সম্পর্কিত তত্ত্বগুলি আলোচনা করুন।

(৪) নেতৃত্বের শৈলী কি? নেতৃত্বের বিভিন্ন শৈলীর ব্যাখ্যা করুন।

(৫) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন ধরনের নেতৃত্বের শৈলীর প্রয়োজন? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করুন।

(৬) পরিস্থিতি অনুযায়ী নেতৃত্ব বলতে কি বোঝায়?

(৭) ম্যানেজেরিয়াল গ্রীড কি? চিত্রসহ আলোচনা করুন।

(৮) প্রেষণা সৃষ্টি ও দলগত সংগঠনে নেতার ভূমিকা কি?

একক ৮ ❑ শিক্ষামূলক পরিকল্পনা (Educational Planning)

গঠন (Structure)

প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

৮.১ শিক্ষামূলক পরিকল্পনার ধারণা

৮.২ শিক্ষা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

৮.৩ শিক্ষামূলক পরিকল্পনার অভিমুখ

 ৮.৩.১ সামাজিক ন্যায়বিচারভিত্তিক অভিমুখ

 ৮.৩.২ সামাজিক চাহিদাভিত্তিক অভিমুখ

 ৮.৩.৩ মানব সম্পদ বিকাশের অভিমুখ

 ৮.৩.৪ আনুপাতিক প্রতিদানের নীতি

৮.৪ বর্তমান শিক্ষা পরিকল্পনার ত্রুটি

৮.৫ বিভিন্ন স্তরে পরিকল্পনা

 ৮.৫.১ বৃহত্তর পরিকল্পনা

 ৮.৫.২ ক্ষুদ্র একক স্তরে পরিকল্পনা

 ৮.৫.৩ তৃণমূল স্তরে পরিকল্পনা

৮.৬ প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা

 ৮.৬.১ প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার পরিধি

 ৮.৬.২ পরিকল্পনার প্রক্রিয়া এবং প্রণালী

৮.৭ সারসংক্ষেপ

৮.৮ প্রশ্নাবলী

প্রস্তাবনা (Introduction)

পরিকল্পনার অর্থ হল কোন উদ্দেশ্যে পৌঁছবার জন্য কি কি কাজ করবে, কখন করবে এবং কেমনভাবে করবে তার অগ্রিম সূচি। পরিকল্পনা ভবিষ্যতের পরিস্থিতি বিচার করে লক্ষ্য স্থির ও লক্ষ্যপূরণের উপায় করা। শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিকল্পনার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি কারণ শিক্ষানীতির মাধ্যমে, শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয় এবং এই উদ্দেশ্যগুলি বাস্তবে সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে হলে সঠিক পরিকল্পনা অত্যন্ত জরুরী। পরিকল্পনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত

গ্রহণের সময় বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণের সাহায্য নেওয়া হয়, যেমন সামাজিক ন্যায় বিচার, জনগণের চাহিদা ইত্যাদি। আবার অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা অর্থাৎ স্থানীয় স্তরে কিংবা কোন একক স্তরে পরিকল্পনার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা থাকা প্রয়োজন।

পরিকল্পনাবিহীন কাজ হালছাড়া নৌকার মত দিশাহীন। এই এককে শিক্ষামূলক পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হবে।

উদ্দেশ্য (Objectives)

এই একককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- শিক্ষামূলক পরিকল্পনার ধারণা, উদ্দেশ্য ও অভিমুখগুলি শিখতে পারবেন।
- বর্তমান শিক্ষা পরিকল্পনার ত্রুটিগুলি বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- বৃহত্তর ক্ষুদ্রতর একক ও তৃণমূলস্তরে পরিকল্পনার ধারণা দিতে পারবেন।
- প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার পদ্ধতি ও প্রণালী সম্বন্ধে বিবরণ দিতে পারবেন।

৮.১ শিক্ষামূলক পরিকল্পনার ধারণা (Concept of Educational Planning)

পরিকল্পনা হল এমন একটি প্রক্রিয়া—যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্য নিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বুদ্ধি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড্রোর (Dror 1963)-এর মতে পরিকল্পনা হল এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ হিসাবে কাজ করার জন্য একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। (Planning is the process of preparing a set of decisions for action in the future)। পরিকল্পনার মূল নীতিটি হল যতগুলি সম্ভব বিকল্প সিদ্ধান্ত বিশ্লেষণ করে তার থেকে সর্বোত্তমটি গ্রহণ করা। পরিকল্পনার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয় তা হল—

— ভবিষ্যত মুখিতা

— উদ্দেশ্যমুখী কাজ

— সীমিত সম্পদের সদ্ব্যবহার করে পারদর্শিতা ক্রমিক উন্নয়ন এবং প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সফল করা।

পরিকল্পনার ধারণাটিকে সাধারণতঃ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়ে থাকে তবুও আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। এবং পরিকল্পনার মূল ধারণাটি যখন শিক্ষার অগ্রগতির জন্য প্রয়োগ করা হয় তখনই শিক্ষামূলক পরিকল্পনার প্রসঙ্গ আসে। সাধারণভাবে পরিকল্পনার যে তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার সব কয়টিই শিক্ষার ক্ষেত্রের সমান প্রযোজ্য। শিক্ষা একটি ব্যাপক ধারাবাহিক গতিশীল কার্যক্রম এবং তা সবসময়ই ভবিষ্যৎমুখী। শিক্ষার উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্পদের সদ্ব্যবহার করে পারদর্শিতার

ক্রমাগত উন্নতি সাধন প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। এইসব প্রসঙ্গ বিচার করে শিক্ষা পরিকল্পনাই উপযুক্ত সংজ্ঞা স্থির করা প্রয়োজন।

Beeby (1967) মনে করেন

Educational Planning is the exercise of foresight in determining the policy, priorities and cost of an educational system having due regard to economic and political realities for the systems potential for growth and for the needs of the country and of the Pupils serving the system. (শিক্ষা ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ বিকাশের সম্ভাবনা এবং ছাত্রছাত্রীদের ও দেশের চাহিদাকে মর্যাদা দিয়ে নীতি, অগ্রাধিকার ও খরচ সম্বন্ধে অগ্রিম দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার প্রক্রিয়াই হল শিক্ষা পরিকল্পনা)।

আবার Coombs (1970) মনে করেন,

Educational Planning is the application of rational, systematic analysis to the process of educational development with the aim of making education more effective is responding to the needs and goals of its students and society (শিক্ষার্থী ও সমাজের চাহিদা ও উদ্দেশ্যের নিরীখে শিক্ষাকে আরও ফলপ্রসূ করার জন্য যুক্তিপূর্ণ, নিয়মাবদ্ধ বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করাকেই বলা হয় শিক্ষামূলক পরিকল্পনা)।

আদর্শ অথবা কার্যকরী শিক্ষা পরিকল্পনার নিম্নলিখিত উপাদানগুলি থাকা প্রয়োজন—

— শিক্ষা পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলির অর্থ এক সংজ্ঞা সহজ ও বোধগম্য হওয়া দরকার। যেমন, সর্বশিক্ষা অভিযান একটি পরিকল্পনা যার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখিত আছে।

— পরিকল্পনা সবসময় স্বচ্ছ ও সহজবোধ্য হবে।

— এটি নমনীয় ও সামঞ্জস্য পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন

— এর মধ্যে সময়সীমা নির্ধারিত থাকবে।

— যে কোন পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে সেই বিষয় সম্পর্কিত প্রতিটি ব্যক্তির অংশগ্রহণের ওপর।

— প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি বিভাগ পরিকল্পনার আওতায় আসবে

— সবশেষে পরিকল্পনা এমন হবে যাতে মানবসম্পদ ও জড় সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার সম্ভব হয়।

৮.২ শিক্ষা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য (Objectives of Educational Planning)

আগেই বলা হয়েছে শিক্ষা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হল ভবিষ্যতের কর্মপন্থা ঠিক করে, তার বাস্তব প্রয়োগ। এছাড়াও পরিকল্পনার আরও কিছু উদ্দেশ্য বা সুবিধা উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন—

— পরিকল্পনার সাহায্যে প্রতিষ্ঠানের সম্পাদিত কাজের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখা সম্ভব। অর্থাৎ কর্মীরা কে কি কাজ কেমন ভাবে করছেন ও কি ধরনের ফল পাচ্ছেন এ সব কিছু নিরীক্ষণ করা সম্ভব হয়।

— ঠিক মত পরিকল্পনা রচনা করলে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। এর জন্য যথাসম্ভব কম অপচয় হয়ে থাকে।

— সমস্যা কোন দিক থেকে আসতে পারে—এই পূর্ব অনুমান পরিকল্পনা দ্বারাই করা সম্ভব।

— সংস্থার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়।

— সবশেষে প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পরিকল্পনা করা প্রয়োজন।

৮.৩ শিক্ষামূলক পরিকল্পনার অভিমুখভ(Approaches to Planning)

পরিকল্পনা রচনা করার সময় বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব এই ছক বা খসড়ার মধ্যে এসে পড়ে। সব সময়ই কিছু বিশেষ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি, দৃষ্টিকোণ অথবা নীতির সাহায্য নিয়ে শিক্ষা পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। এই বিশেষ নীতিগুলিকে শিক্ষা পরিকল্পনার অভিমুখ বা (approach) বলা যেতে পারে। যে নীতিগুলির দ্বারা পরিকল্পনা সাধারণতঃ নির্ধারিত হয় সে গুলি হল,

— সামাজিক ন্যায় বিচারভিত্তিক অভিমুখ (Social Justice approach)

— সামাজিক চাহিদাভিত্তিক অভিমুখ (Social Demand approach)

— মানবসম্পদ বিকাশের অভিমুখ (Human Resouce Development approach)

— আনুপাতিক প্রতিদান প্রাপ্তির নীতি (Rate of return approach)

৮.৩.১ সামাজিক ন্যায় বিচারভিত্তিক অভিমুখ (Social Justice Approach)

এক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায়বিচারের বা কল্যাণের কথা স্মরণ রেখে শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। যেমন আমাদের দেশে সরকার অনগ্রসর জাতি বা উপজাতি লোকের উন্নতির জন্য যে সব পরিকল্পনা রচনা করেন তার মূল ভিত্তি হল সামাজিক ন্যায় বিচার। বহুযুগ ধরে এই নিপীড়িত গোষ্ঠীবর্গকে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য এইসব পরিকল্পনা রচিত হয়। এছাড়া মহিলা ও শিশুরাও আমাদের দেশে অনেক সময় সুবিচার পায় না। এদের কথা ভেবেও অনেক বিশেষ পরিকল্পনা সূচী নেওয়া যা কিনা সামাজিক সমতা বজায় রাখার এক প্রচেস্টা। গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দেশে অনেক পরিকল্পনাই এই নীতির ভিত্তিতে গৃহিত হয়ে থাকে।

অর্থনীতির বিশেষ বিশেষ চিন্তাধারায় সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রসঙ্গাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ভারতের সংবিধান রচয়িতারাও প্রথম থেকেই সামাজিক ন্যায়বিচারের বিষয়টিকে প্রথম থেকেই গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন। কিন্তু ন্যায়বিচারের পদ্ধতিগত দিক পরবর্তীকালে কিছু সামাজিক বিভাজন ও বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। এই জন্য সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে রচিত পরিকল্পনায় কিছু কিছু ত্রুটি দেখা যায়। যেমন,

— এই জাতীয় পরিকল্পনা দীর্ঘকাল ধরে চললে, সামাজিক বিভাজন সৃষ্টি হতে পারে।

— সামাজিক অসাম্য কমিয়ে আনার পরিবর্তে সহজপথে কিছু সংখ্যক মানুষকে সন্তুস্ট রাখার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

— পরনির্ভরশীলতার মনোভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং স্বাবলম্বনের প্রচেস্টা কমে।

— পরিকল্পনার ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

৮.৩.২ সামাজিক চাহিদাভিত্তিক অভিমুখ (Social Demand Approach)

সামাজিক অর্থাৎ জনগণের চাহিদা অনুযায়ী পরিকল্পনা রচনার অর্থ হল সাধারণ লোকের যা ইচ্ছা বা প্রয়োজন তাকেই গুরুত্ব দিয়ে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে থাকে। যদিও কোন কোন অর্থনীতিবিদ্ মনে করেন পরিকল্পনায় যদি জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন না ঘটে, তবে তা ব্যর্থ, তবুও এই ধরনের পরিকল্পনা সাধারণ নাগরিকের ইচ্ছা ও প্রত্যাশার কথা ভেবে নেওয়া হলেও অনেক সময় এই ধরনের পরিকল্পনা অর্থনৈতিক দিক

থেকে ফলপ্রসূ হয় না। যেমন সাধারণ উচ্চশিক্ষার ডিগ্রী, বি.এ. অথবা এম. এ. ডিগ্রী লাভের জন্য সাধারণ জনগণের মধ্যে অনেকসময় অত্যন্ত আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। কারণ এই ধরনের শিক্ষা সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভে হয়ত সাহায্য করে কিন্তু কর্মক্ষেত্রে ডিগ্রী অনুযায়ী চাকুরী পাওয়া সম্ভব হয় না। ফলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় এবং অর্থনীতির উপরও অহেতুক চাপ সৃষ্টি হয়। সরকার এই চাপের মুখে অনেক সময় নতিস্বীকার করে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান খুলতে বাধ্য হয়।

৮.৩.৩ মানবসম্পদ বিকাশের অভিমুখ (Human Resource Development Approach)

এক সময়ে প্রাকৃতিক (জৈব এবং অজৈব) সম্পদকেই একমাত্র সম্পদ হিসাবে গণ্য করা হত এবং মানুষকে মনে করা হত সম্পদের উপভোক্তা। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাকৃতিক সম্পদের উৎপাদন বাড়ানো এবং উপভোক্তার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা একান্ত আবশ্যিক বলে গণ্য হত। পরবর্তীকালে মানুষকেও সম্পদ হিসাবে গণ্য করা হতে থাকে। কারণ,

— মানুষের শ্রম একত্রিত হয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করে।

— মানুষের দক্ষতা ক্রমাগত চরম উৎকর্ষে পৌঁছাতে পারে যা উৎপাদনের মান বৃদ্ধির পক্ষে অপরিহার্য।

— মানুষের মেধাকে সবচেয়ে বড় সম্পদ বলে মনে করা হয় কারণ, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিল্প-সাহিত্যে, সৃজনশীলতায় মেধা সম্পদই কোন জাতিকে শ্রেষ্ঠত্বের পথে নিয়ে যায়।

মানুষের দৈহিক শক্তি বা শ্রম সীমিত কিন্তু মেধা ও দক্ষতা অসীম। সুতরাং নাগরিকদের দৈহিক স্বাস্থ্য ও শক্তি অটুট রেখে মেধা ও দক্ষতা বৃদ্ধির সমস্ত প্রয়াসকেই বলা হয় মানব সম্পদ বিকাশ (Human Resource Development)। অর্থাৎ, যা সম্ভাবনা হিসাবে আছে, তাকে পরিপূর্ণভাবে পরিস্ফূট করাই হল মানব সম্পদ বিকাশ।

মানবসম্পদ বিকাশের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিকল্পনা যে কোন দেশের অর্থনীতির বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানবসম্পদ বিকাশের প্রয়োজন অনুযায়ী যখন পরিকল্পনা নেওয়া হয় তখন কতগুলো বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেগুলি হল—

— নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, অর্থনীতির পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী করা।

— বেকার জনিত সমস্যার সমাধান করা ও কর্মসংস্থানের নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি করা।

— অর্থনৈতিক বিকাশ ও গঠনগত সামঞ্জস্য (Structural adjustment) এর সাথে সাথে কোন ধরনের শ্রমিকের প্রয়োজন হচ্ছে বা প্রয়োজন হ্রাস পাচ্ছে তা নথিবদ্ধ করা মানবসম্পদ বিকাশের প্রয়োজন অনুযায়ী যে পরিকল্পনা করা হয় তার মূল উদ্দেশ্যই হল উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা। এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন, আয়োজন ও মূল্যায়ন করা। যাতে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়। স্বাধীনতার পর আমাদের দেশে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন, মূলতঃ মানবসম্পদ বিকাশের লক্ষ্যে প্রচলন করা হয়েছিল।

৮.৩.৪ আনুপাতিক প্রতিদান প্রাপ্তি নীতি (Rate of Return Approach)

এই দৃষ্টিভঙ্গির মূল বিষয় হচ্ছে শিক্ষাকে একটি মূলধন ও বিনিয়োগ এর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা। এখানে

ধরা হয় মানুষের দক্ষতা একটি সম্পদ ও তা বিপনন যোগ্য। এই সম্পদ-এর যথাযোগ্য বিকাশ ঘটানোর জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে এমনভাবে বিনিয়োগ করতে হবে যাতে, এই বিনিয়োগ থেকে ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্য প্রতিদান বা return পাওয়া সম্ভব হয়। মানব সম্পদ বিকাশের নীতিতেও মানুষের দক্ষতা ও মেধাকে সম্পদ মনে করা হয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে তার বিপনন মূল্য বিচার করা হয় না। যেমন, একজন কবিকে তার কবিত্বশক্তি বিকাশের সুযোগ দিলে প্রত্যক্ষভাবে জাতি প্রতিদান হিসাবে তার বিনিময়মূল্য কিছু পাবে না। কিন্তু তার কবিখ্যাতি যত বিস্তৃত হবে, দেশ ততই গর্বিত হবে। অপরদিকে প্রতিদানের নীতি অনুযায়ী, সম্পদ হিসাবে কবিতার বিনিময়মূল্য কম, অতএব সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃথা। অর্থাৎ এই পরিকল্পনা অনুযায়ী যে ধরনের শিক্ষা আর্থিক দিক থেকে লাভদায়ক শুধু সেই শিক্ষার জন্যই অর্থ বরাদ্দ করা দরকার। পরিকল্পনার মূল নীতি হল অর্থ বরাদ্দের সূচক হিসাবে আনুপাতিক প্রতিদানের হার।

কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গির অসুবিধা হল যে অর্থনীতির বিচারে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিদান বা Return পরিমাপ করা সম্ভব নয় কারণ শিক্ষার দ্বারা সমাজে বা মানুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে শুভ পরিবর্তন হতে পারে তার গাণিতিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়। অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নতি ছাড়াও সাধারণ শিক্ষা একজন মানুষের জীবনের মান কিভাবে সমৃদ্ধ করে তা অনুমান করা বা বিশ্লেষণ করা দুরূহ ব্যাপার। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে খরচ ও লাভের হিসাব রাখা অর্থাৎ Cost-benefit analysis করা দরকার।

৮.৪ বর্তমান শিক্ষা পরিকল্পনার ত্রুটি (Drawbacks of present Educational Planning)

পরিকল্পনার তিনটি স্তর (Stages) হল নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা রচনা ও পরিকল্পনার বাস্তব প্রয়োগ। পরিকল্পনার সার্থকতা নির্ভর করে এই তিনটি স্তরের সাফল্যের উপর। আমাদের দেশে শিক্ষার যথেষ্ট অগ্রগতি হলেও শিক্ষা পরিকল্পনায় অনেক ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

— আমাদের পরিকল্পনা ব্যবস্থা অনেকাংশে কেন্দ্র দ্বারা নির্ধারিত (Centralised Planning) আধুনিক প্রশাসনে এখন বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার (decentralised planning) উপর জোর দেওয়া হয়। মনে করা হয় স্থানীয় জনগণের প্রয়োজন ও সুবিধার কথা ভেবে শিক্ষা পরিকল্পনা তথা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনা করা উচিত। আদর্শগত ভাবে কেন্দ্র সরকারের দ্বারা গঠিত সাধারণ নীতি ও নির্দেশ এর সাহায্যে স্থানীয় স্তরে পরিকল্পনা রচিত হলে তবেই তা ফলপ্রসূ হয়। কিন্তু আমাদের দেশে বিভিন্ন কারণে স্থানীয় প্রশাসনকে যথেষ্ট শক্তিশালী বা কর্মক্ষম করা যায়নি যার ফলে শিক্ষা পরিকল্পনার বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব হচ্ছে না।

দ্বিতীয়ত, আমাদের পরিকল্পনার সমস্যা অর্থনৈতিক নয় বরং রাজনৈতিক। কারণ অর্থনৈতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার অনেক সময় হয় না। প্লানিং কমিশনের ভূমিকা এই ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কমিশন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে পরিকল্পনা সম্পর্কিত সমন্বয় সাধনকারী সংস্থা (nodal agency for

coordinating Central and State plan)। পরিকল্পনা কিভাবে রূপায়িত হচ্ছে তার উপর নজর রাখা এই কমিশনের কাজ। কিন্তু কমিশনের এই ভূমিকা অনেক সময় সমালোচিত হয়েছে।

— পরিকল্পনার বিকেন্দ্রীকরণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হলেও রাজ্যগুলি নিজস্ব সম্পদ উৎপাদন বা সৃষ্টি করার দায়িত্ব নিতে চায় না। তাই অনেক সময় রাজ্য সরকার বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষপাতী হয় না।

— আবার রাজ্যস্তরে রাজনৈতিক নেতা এবং আধিকারীকরা স্থানীয় স্তরের প্রতিষ্ঠানগুলিকে সম্পদ ও ক্ষমতার অংশীদার করতে অনিচ্ছুক হয়।

— শিক্ষা পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব দেখা যায়।

— সবশেষে জেলাস্তরে পরিকল্পনা সংস্থাগুলি যথেষ্ট প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও সরঞ্জামেরও অভাব থাকে।

৮.৫ বিভিন্ন স্তরে পরিকল্পনা (Planning at Various Levels)

পরিকল্পনা যেমন বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে তৈরী হতে পারে তেমনি আবার বিভিন্ন স্তরে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়ে যাতে। সর্বোচ্চ স্তরে কেন্দ্রীয় সরকারই সাধারণতঃ নীতি নির্দেশনা নির্ণয় করার পরে পরিকল্পনার ছক তৈরী করে থাকে আবার এই কাজ স্থানীয় স্তরে বা রাজ্যস্তরে হতে পারে। তাই স্তরভিত্তিক পরিকল্পনাকে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

— সার্বিক পরিকল্পনা বা বৃহত্তর পরিকল্পনা (Macroplanning)

— ক্ষুদ্র একক স্তরে পরিকল্পনা (Micro Planning)

— তৃণমূল উৎস স্তরে পরিকল্পনা (Grass-root Planning)

৮.৫.১ বৃহত্তর পরিকল্পনা. (Macro Planning)

বৃহত্তর পরিকল্পনা সাধারণতঃ প্রশাসনের উচ্চতম স্তরে নেওয়া হয়ে থাকে। যেমন কেন্দ্রস্তরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যেখানে সারা দেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এই ধরনের পরিকল্পনায় সমগ্র দেশের শিক্ষার বিস্তারের জন্য বিশদ উদ্দেশ্য, কৌশল এবং কর্মপদ্ধতি স্থির করা হয়। অনেক সময় রাজ্য স্তরেও এই জাতীয় পরিকল্পনা নেওয়া হয়। বৃহত্তর পরিকল্পনার সুবিধা এই যে অর্থনীতি, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, জনগোষ্ঠীর প্রকৃতি (Demographic Charactistics) ইত্যাদি যাবতীয় প্রসঙ্গ পরিকল্পনার ভিত্তি হিসাবে গৃহীত হতে পারে। এর ফলে আঞ্চলিক বৈষম্য কম হয় এবং সম্পদের সুষম বণ্টন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ও জনগোষ্ঠীর প্রতিটি খুঁটিনাটি তথ্যের প্রতি সুবিচার করা এই জাতীয় পরিকল্পনার সম্ভব হয় না। কিছু কিছু স্থূল ও মোটামুটি তথ্যের ভিত্তিতে পরিকল্পনা রচিত হয়।

৮.৫.২ ক্ষুদ্র একক স্তরে পরিকল্পনা (Micro Planning)

আবার অন্যদিকে যখন কোন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এককের জন্য, যেমন জেলাভিত্তিক, পরিকল্পনা স্থির করা হয় তখন তাকে মাইক্রো পরিকল্পনা বলা হয়। ক্ষুদ্র একক স্তরে পরিকল্পনা কথাটি শুধুমাত্র ভৌগোলিক, আঞ্চলিক, বা প্রশাসনিক বিভাগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। যখন কোন বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ হিসাবে একটি ছোট বিষয়ের খুঁটিনাটি নিয়ে পরিকল্পনা রচনা করা হয় তাকেও ক্ষুদ্র একক স্তরে পরিকল্পনা করা বলা হয়। যেমন, কোন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ নীতি ও উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ইত্যাদি সম্বন্ধে চূড়ান্ত পরিকল্পনা করার আগে, দেশের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাঁদের নিজস্ব পরিকল্পনা রচনা করে। তার ভিত্তিতে রাজ্য সরকার সমগ্র রাজ্যের জন্য উচ্চ শিক্ষার একটি পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরী করার পর বিশ্ববিদ্যালয় মুঞ্জুরী কমিশন (UGC) উচ্চশিক্ষার জন্য চূড়ান্ত পরিকল্পনা রচনা করে। এইভাবে যে কোন ক্ষেত্রেই বৃহত্তর পরিকল্পনা ও ক্ষুদ্র একক স্তরে পরিকল্পনা পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে।

সুতরাং এ কথা বলা দরকার যে মাইক্রো এবং ম্যাক্রো পরিকল্পনা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় বরং এরা পরস্পরের পরিপূরক। মহান্তির (Mohanty 2005) বক্তব্য অনুসারে ম্যাক্রো পরিকল্পনা হল দেহের অস্থি যা দেহে কাঠামো তৈরী করে ও শক্তি জোগায় অন্যদিকে মাইক্রো পরিকল্পনা হল শরীরের রক্ত ও মাংস যা দেহকে পূর্ণতা দেয়।

৮.৫.৩ তৃণমূল স্তরে পরিকল্পনা (Grass-root level Planning)

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে আমাদের শিক্ষা পরিকল্পনার একটি ত্রুটি হল কেন্দ্র বা উচ্চস্তরের পরিকল্পনার উপর বেশি জোর দেওয়া এবং নীচের স্তরের পরিকল্পনা গ্রহণ তেমন গুরুত্ব পায়নি। স্থানীয় স্তরে পরিকল্পনা শুধুমাত্র কেন্দ্র দ্বারা নির্দেশিত উদ্দেশ্য (target) পূরণ করা আর তার তদারকি করা। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ J. P. Naik (1969) বলেছেন পরিকল্পনা এমন হওয়া উচিত যেখানে দুই স্তরের মধ্যে চিন্তা ভাবনার প্রতিনিয়ত আদানপ্রদান চলতে থাকে (Continuous interplay and travelling of ideas up and down) এ প্রসঙ্গে তৃণমূল স্তরে পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তৃণমূল স্তরে জনগণের চাহিদা প্রয়োজন ও সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহারের কথা মনে রেখে তবেই পরিকল্পনার ছক তৈরী করা উচিত। আবার এর সাথে ম্যাক্রোস্তরে যে সাধারণ নীতি নির্দেশ গ্রহণ করা হয়েছে তার সাথে তৃণমূল স্তরের পরিকল্পনার একটা সমন্বয় বা যোগসূত্র থাকলে তবেই আদর্শ পরিকল্পনা ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

পরিকল্পনা আবার সময়ের ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদী বা স্বল্প মেয়াদী হতে পারে। তবে জাতীয় শিক্ষাস্তরে পরিকল্পনা সবসময়ই দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী আবার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিজস্ব কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করে যেগুলি উদ্দেশ্য বিশেষ দীর্ঘস্থায়ী বা স্বল্পস্থায়ী হতে পারে। তবে শিক্ষা পরিকল্পনা মাইক্রো বা ম্যাক্রো যে স্তরেই হোক না কেন তা দীর্ঘমেয়াদী হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

পঞ্চায়েত স্তরের পরিকল্পনার প্রক্রিয়াকে বিস্তৃত করা হলে তবে তা প্রকৃত অর্থে তৃণমূল স্তরের পরিকল্পনা বলে গণ্য হবে। সেজন্য পঞ্চায়েত পর্যায়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় থাকা দরকার।

সম্প্রতি আমাদের দেশে শিক্ষা পরিকল্পনায় স্থানীয় স্তরে ব্লক ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা

চলছে। এই ব্যবস্থা এখনও অনেক দোষত্রুটি থেকে গেছে তবে শিক্ষা পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণে এ সংস্থাগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এ ব্যাপারে যথেষ্ট প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে।

৮.৬ প্রতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা (Institutional Planning)

ক্ষুদ্র একক সংক্রান্ত বা মাইক্রো স্তরের পরিকল্পনার একটি উদাহরণ হল প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা। এর অর্থ হল একটি প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান, নতুন নতুন ক্ষমতার উন্মোচন পাঠ পদ্ধতির উন্নয়ন, সহপাঠ ক্রমিক কার্যাবলীর ব্যবস্থা, শিক্ষার্থীর পূর্ণ বিকাশ ইত্যাদি উদ্দেশ্যগুলি চরিতার্থ করার জন্য কোন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজের চাহিদা ও সামর্থ্য অনুযায়ী যে পরিকল্পনা খসড়া তৈরী করে তাই হল প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা। এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল প্রতিষ্ঠানের সবরকম সম্পদের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার।

আগেই বলা হয়েছে পরিকল্পনা হবে দ্বিমুখী। তৃণমূল স্তরে হলেও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার সাথে তার সামঞ্জস্য থাকবে। আবার কেন্দ্রীয় স্তরে নির্ধারিত নীতিগুলি সকলের বোধগম্য হয় এমনভাবে তৃণমূল স্তরে পৌঁছে দিতে হবে। এই ধরনের আধুনিক মনোভাবসম্পন্ন যে পরিকল্পনার কথা ভাবা হয় প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা তারই ফলশ্রুতি। এই ধরনের পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যগুলি এই রূপ—

— এই পরিকল্পনা চাহিদাভিত্তিক, অনুদানভিত্তিক নয়, এখানে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব মানবিক ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া এবং এদের সদ্ব্যবহারের কথা বলা হয়।

— এই ধরনের পরিকল্পনায় অপচয় কম হয়। অনুদানের টাকা যাতে অপ্রয়োজনীয় কাজে অপব্যয় না হয়, তার দিকে নজর রাখা হয়।

— প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা একটি সমবায়ভিত্তিক পরিকল্পনা, যার মধ্যে প্রতিষ্ঠানের সকলেই যুক্ত থাকে।

— ভবিষ্যতমুখী এই পরিকল্পনায় শুধুমাত্র বর্তমান সমস্যার সমাধান করাই হয় না, আগামী দিনের প্রয়োজনীয়তার উপরও দৃষ্টি দেওয়া হয়ে থাকে।

— কর্মভিত্তিক এই পরিকল্পনা সাধ্যাতীত হওয়ার দরকার নেই কম খরচে সফল হবে এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

৮.৬.১ প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার পরিধি (Scope of Institutional Planning)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কাজ এই পরিকল্পনার আওতায় পড়ে। তাই এর পরিধি নির্ধারণ করা খুব কঠিন। তবুও প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করা যায় যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানের উন্নতি করা সম্ভব, এগুলি হল—

— **শিক্ষাসংক্রান্ত পরিকল্পনা** (Academic Plan) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজই হল শিক্ষার প্রসার। এই লক্ষ্যপূরণে তাই বেশ কিছু পরিকল্পনা নেওয়া যেতে পারে। যেমন, পাঠক্রম পরিচালনা, পাঠক্রমের ক্রমোন্নয়ন মূল্যায়ন ব্যবস্থা কার্যকরী করা, আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ, ছাত্রভর্তির নিয়ম কানুন, ছাত্র উপস্থিতির হার শিক্ষায় অপচয় কমানো ইত্যাদি সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সহপাঠক্রমিক পরিকল্পনা (Co-curricular Plan)—পাঠক্রমের শিক্ষার সাথে সহপাঠক্রমিক শিক্ষাও অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ। একজন শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য পড়াশোনার সাথে অন্যান্য সক্রিয়তার ব্যবস্থা শিক্ষালয়ে থাকে। এ ব্যাপারেও পরিকল্পনা মত কাজ না করলে সহপাঠক্রমিক কাজকর্মের উদ্দেশ্য সাধন হয় না। খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক বিষয়, বার্ষিক ভ্রমণ, সমাজ সেবা, শিক্ষা প্রদর্শনী ইত্যাদি অনেক বিষয় এই পরিকল্পনার আওতায় পড়ে।

আর্থিক ও প্রশাসনিক পরিকল্পনা (Economic and Administrative Planning)—প্রশাসনিক পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষালয়ের সীমিত আর্থিক সম্পদ কিভাবে ব্যবহার করলে অপচয় সবচেয়ে কম হবে তার নির্দেশ পাওয়া যায়। অনেক সময়ই প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সম্পদ মানবিক সম্পদ (সুদক্ষ কর্মীর সুবিধা) নিজস্ব স্থান বিল্ডিং ইত্যাদি অব্যবহৃত থেকে যায়। পূর্ব পরিকল্পনা করে কাজ শুরু করলে সম্পদের অপচয় বোধ করা যায়।

পরিষেবা সংক্রান্ত পরিকল্পনা (Service Planning)—বিদ্যালয়ে বিভিন্ন পরিষেবার ব্যবস্থা থাকে; যেমন ছাত্রদের জন্য নির্দেশনা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ছাত্রদের আবাসিক ব্যবস্থা এই পরিষেবাগুলির কার্যেপযোগিতা বৃদ্ধি করার জন্যও পরিকল্পনার দরকার হয়। আহারের ব্যবস্থা থাকলে স্বাস্থ্যসম্মত পুষ্টিকর আহারের জন্যও পরিকল্পনা দরকার।

প্রদীপনের ব্যবহার (Use of Teaching Aids)—আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিতে প্রদীপণ ব্যবহার করা হয়। কিভাবে এই সব প্রদীপণ ব্যবহার করা হবে এবং বিভিন্ন ধরনের প্রদীপণ-এর ব্যবস্থা করা সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির জন্যও আগে থেকে চিন্তাভাবনা করে রাখা দরকার। পাঠাগার পরিচালনাও এরই অন্তর্গত।

এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা রক্ষা, শ্রেণীকক্ষের উপযুক্ত দেখাশোনা (Classroom management) করার জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজন।

শিক্ষকের শিক্ষণ পদ্ধতির ক্রমাগত উন্নয়নের জন্য তাদের ক্রমান্বয়ে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যও প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন পরিকল্পনা করে। যেমন সেমিনার, কর্মশালা, গ্রীষ্মকালীন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, কর্মকালীন প্রশিক্ষণ ইত্যাদিও প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার আওতায় পড়ে।

৮.৬.২ পরিকল্পনার প্রক্রিয়া এবং প্রণালী (Process of Planning and Method)

প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা কার্যকরী ও সফল করার জন্য কতগুলি পদক্ষেপ নেওয়া হয়ে থাকে। এই পদক্ষেপগুলি হল নিম্নপ্রকার—

—বর্তমান পরিস্থিতির বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণে প্রতিষ্ঠানের চাহিদার কথা মনে রেখে প্রধান শিক্ষক তাঁর সহকর্মীদের সাহায্যে বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করবেন। যেমন প্রতিষ্ঠানের গৃহের স্থান যথেষ্ট আছে কিনা আসবাব পত্রেরও অন্যান্য যন্ত্রপাতি কি আছে, গ্রন্থাগার ও পরীক্ষাগারের অবস্থা কি, কর্মচারীর সংখ্যা যথেষ্ট কি না, কর্মসূচীর কি ধরনের পরিবর্তন দরকার, ছাত্রাবাস, কর্মীদের বাস গৃহ খেলার মাঠ আছে কিনা, এবং পরীক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নের প্রয়োজন কতখানি ইত্যাদি।

— এর পরের পদক্ষেপ হল প্রতিষ্ঠানের সম্পদের খতিয়ান। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সম্পদ, অন্যান্য কোন সংস্থা থেকে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে কিনা, তার তথ্য সংগ্রহ করার দরকার হয়। এই পর্যায়ে তিনধরনের সম্পদের উল্লেখ থাকবে— প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সম্পদ, সরকারী সাহায্যের পরিমাণ ও সামাজিক গোষ্ঠী থেকে পাওয়া যেতে পারে এমন সাহায্য যেমন ব্যাঙ্ক, বৃত্তিমূলক সংস্থা, কারখানা শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। এর সাথে পরিসংখ্যানগত তথ্যও থাকবে যেমন ছাত্রভর্তির সংখ্যা, কর্মচারী সংখ্যা, বই খাতা, পরীক্ষার ফলাফল ইত্যাদি।

— পরিকল্পনার তৃতীয় স্তরে উন্নয়নমূলক কাজের খসড়া তৈরী করা হয়। এই উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা দুই ধরনের হতে পারে—স্বল্পমেয়াদী কর্মসূচি ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচি। প্রতিটি উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার গুরুত্ব বিচার করা হবে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি প্রতিষ্ঠানের কাছে কতখানি প্রয়োজনীয় আর্থিক দায়িত্ব কতখানি নিতে হবে এবং বিষয়টি কতটা জরুরী।

যে সব প্রজেক্ট পরিকল্পনার আওতায় আনা যেতে পারে, তা হল বিল্ডিং সংক্রান্ত প্রজেক্ট, বিদ্যালয় প্রাঙ্গান। শিক্ষার সাজসরঞ্জাম, শিক্ষণ পদ্ধতি, শিক্ষার্থীর কল্যাণমূলক কর্মসূচি সারা বছরের শিক্ষা সংক্রান্ত সময়ের নির্দেশিকা (academic Calender) প্রাঙ্গণের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি, লাইব্রেরী উন্নয়ন, বিজ্ঞান ক্লাব বাস্তবমুখী গবেষণার (action research) উদ্যোগ নেওয়া ইত্যাদি। এই ধরনের গবেষণা ও পরিকল্পনার মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা যেমন শিক্ষায় অপচয় স্কুল পালানো, গণিতে বা অন্য বিষয়ে অক্ষমতা, শিক্ষায় অনগ্রসরতা ইত্যাদির সমাধান করা সম্ভব হয়।

এর পরে পরিকল্পনা রূপায়ন করা হয়। রূপায়নের সময় ও পরিকল্পনা প্রস্তুতির সময় প্রত্যেকের সহযোগিতা নেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানের প্রধানের নেতৃত্বে অন্যান্য সকল শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী একসঙ্গে পরামর্শ ও তথ্য সংগ্রহ করে এই কাজগুলি বাস্তবায়িত করেন।

সবশেষে পরিকল্পনার মূল্যায়ণ অত্যন্ত জরুরী। পরিকল্পিত কাজের পরিমানগত ও গুণগত ফল বিশ্লেষণ করে পরিকল্পনার সাফল্য নির্ণয় করা হয়। নিম্নলিখিত রেখার মাধ্যমে সমস্ত পরিকল্পনা পদ্ধতির ধাপগুলি দেখানো হল।

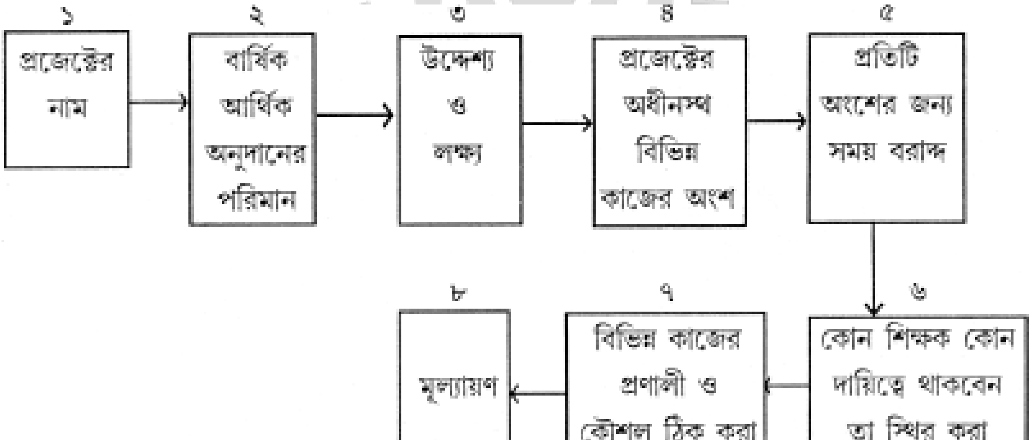

চিত্র ৮.১ : প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার বিভিন্ন স্তর

৮.৭ সারসংক্ষেপ (Summary)

পরিকল্পনা কথাটির অর্থ পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য পূরণের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া। পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনার একটি আবশ্যিক অঙ্গ। পরিকল্পনা বিহীন কাজ হালছাড়া নৌকার মত দিশাহীন। পরিকল্পনার তিনটি বৈশিষ্ট্য— ভবিষ্যত মুখিতা, উদ্দেশ্যমুখী কাজ, এবং সীমিত সম্পদের সদ্ব্যবহার করে পারদর্শিতার ক্রমিক উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য সফল করা।

শিক্ষা পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলির সংজ্ঞা স্পষ্ট ও সহজবোধগম্য হওয়া দরকার, পরিকল্পনা হবে স্বচ্ছ ও সহজ। নমনীয় ও সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সময়সীমা যুক্ত। এছাড়াও সকলের নিশ্চিত অংশগ্রহণ এবং সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করাও ব্যবস্থা থাকা দরকার। শিক্ষা পরিকল্পনার অনেকগুলি অভিমুখ নির্ধারিত করা হয়েছে, যেমন, সামাজিক চাহিদা, সামাজিক ন্যায় বিচার, মানব সম্পদের বিকাশ, ও আনুপাতিক প্রতিদান প্রাপ্তি।

আমাদের শিক্ষা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। কারণ, অধিকাংশ পরিকল্পনা কেন্দ্রীভূত। বিকেন্দ্রীকরণ না হওয়ায় সর্বস্তরের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন পরিকল্পনায় দেখা যায় না। আমাদের পরিকল্পনায় অর্থনীতি অপেক্ষাও রাজনীতির প্রভাব বেশি।

কোন কোন ক্ষেত্রে পরিকল্পনার বিকেন্দ্রীকরণ হলেও, তাদের নিজস্ব সম্পদ সৃষ্টির ব্যবস্থা না থাকায় পরিকল্পনা কার্যকর করতে হলে অনুদানের উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। এছাড়াও আছে শিক্ষা পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মধ্যে অসঙ্গতি এবং বিকেন্দ্রায়িত পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের দক্ষতা এবং প্রশিক্ষণের অভাব।

শিক্ষা পরিকল্পনা বৃহত্তর একক, ক্ষুদ্রতর একক এবং তৃণমূল স্তরে হতে পারে। ক্ষুদ্র একক স্তরে পরিকল্পনার উদাহরণ, প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা। প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যগুলি হল, এই পরিকল্পনা চাহিদা ভিত্তিক, নিজস্ব মানবিক ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল, সমবায় ভিত্তিক, ও ভবিষ্যতমুখী। প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার পরিধির অন্তর্গত বিষয়গুলি— শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনা, সহপাঠক্রমিক পরিকল্পনা, প্রশাসনিক, পরিষেবা সংক্রান্ত, পাঠাগার, শৃংখলা রক্ষা সংক্রান্ত এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত পরিকল্পনা।

প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার পদ্ধতিগুলি হল, প্রথমে বর্তমান পরিস্থিতির বিশ্লেষণ, প্রতিষ্ঠানের সম্পদ কি আছে তার খতিয়ান এবং তার ভিত্তিতে একটি উন্নয়নমূলক কাজের খসড়া তৈরী করা। এরপর সম্ভাব্য বাধা ও সমস্যাগুলি চিহ্নিত করা ও তার প্রতিবিধানের কথা ভাবা দরকার। তারপর বিভিন্ন কাজের প্রণালীও কৌশল স্থির করে তা কার্যকর ও ফলাফল মূল্যায়ন করা দরকার। সাফল্য বা ব্যর্থতার ভিত্তিতে পরিকল্পনার পুনর্বিন্যাস করাও প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার অংশ।

৮.৮ প্রশ্নাবলী

(১) পরিকল্পনার ধারণা দিন। কেন শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়ে থাকে?

(২) শিক্ষামূলক পরিকল্পনার বিভিন্ন অভিমুখ (approach)গুলি আলোচনা করুন। কোন পরিস্থিতি অনুযায়ী কোন অভিমুখটি প্রযোজ্য বলে মনে করা হয়?

(৩) স্তরভিত্তিক শিক্ষা পরিকল্পনা বলতে কি বোঝায়; মাইক্রো ও ম্যাক্রো পরিকল্পনা কি উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করুন।

(৪) আমাদের দেশে শিক্ষা পরিকল্পনার ত্রুটিগুলো কি কি? কিভাবে এই ত্রুটি দূর করা যায়?

(৫) প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা কি? এই পরিকল্পনার মধ্যে শিক্ষার কোন কোন ক্ষেত্রগুলি অন্তর্গত? এই পরিকল্পনার স্তরগুলি আলোচনা করুন।

একক ৯ ❑ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া (Control Process)

গঠন (Structure)

প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

৯.১ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া

৯.২ শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রণের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র

৯.২.১ প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্র

৯.৩ শিক্ষাক্ষেত্রে মান নির্ধারণকারী সংস্থা

৯.৩.১ NAAC

৯.৩.২ National Council of Teacher Education

৯.৪ শিক্ষায় মান নিয়ন্ত্রণ

৯.৪.১ মান সম্বন্ধে ধারণা

৯.৪.২ শিক্ষায় মান নিয়ন্ত্রণ

৯.৫ শিক্ষা ক্ষেত্রে সার্বিক গুণমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ

৯.৬ সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন

৯.৭ সারসংক্ষেপ

৯.৮ প্রশ্নাবলী

প্রস্তাবনা (Introduction)

শিক্ষা ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ নিয়ন্ত্রণের অভাবে যে কোন প্রতিষ্ঠান তার উদ্দেশ্যগুলি সফল করতে ব্যর্থ হয়। এছাড়া আরো গুরুত্বপূর্ণ হল শিক্ষার কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা বেশি জরুরী। সেই ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। এ প্রসঙ্গে আরও জানা দরকার এই নিয়ন্ত্রণ রক্ষাকারী অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত মান নির্দেশকারী সংস্থাগুলি কি কি এবং তাদের কর্মপদ্ধতিই বা কি। বিশ্বায়নের সাথে সাথে শিক্ষার সঠিক মান বজায় রাখা একান্ত দরকার তাই শিক্ষায় মান নিয়ন্ত্রণ (Quality Control) এবং সঠিক মানের প্রতিশ্রুতি (quality assurance) এই দুটি ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা থাকা দরকার।

উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ধারণা দিতে পারবেন এবং নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রগুলি বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষাক্ষেত্রে মান নির্ধারণকারী সংস্থাগুলির নাম ও কাজের বিবরণ দিতে পারবেন।
- শিক্ষাক্ষেত্রে সার্বিক গুণমান নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব ও প্রক্রিয়া অনুধাবন করতে পারবেন।
- সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন সম্বন্ধে ধারণা দিতে পারবেন।

৯.১ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া (Control Process)

সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যেকোন সংস্থার একটি বিশেষ তত্ত্বাবধানমূলক কাজ। নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার অর্থ হল উদ্দেশ্য অনুযায়ী সংস্থার কাজগুলি ঠিকমত সম্পাদিত হচ্ছে কিনা তা দেখা। Koontz এবং O' Donnell এর মতে "The managerial function of controlling is the measurement and correation of the performance of activities of subordinates in order to make sure that enterprise objectives and the plans devised to attain them are being accomplished. (ব্যবস্থাপনার অধীন নিয়ন্ত্রণ ক্রিয়ার অর্থ হল সংস্থার উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্যপূরণের জন্য গৃহীত পরিকল্পনা কতটা কার্যকর হয়েছে তার পরিমাপ ও সংশোধন)। নিয়ন্ত্রণ-এর অর্থই হল আদর্শ মানের সাথে সম্পাদিত কাজের তুলনামূলক বিচার করা এবং যদি সম্পাদিত কাজ আদর্শ মানের থেকে নিম্নস্তরের হয় তবে সংশোধনমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

নিচের চিত্রের মাধ্যমে এই নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে দেখানো যায়।

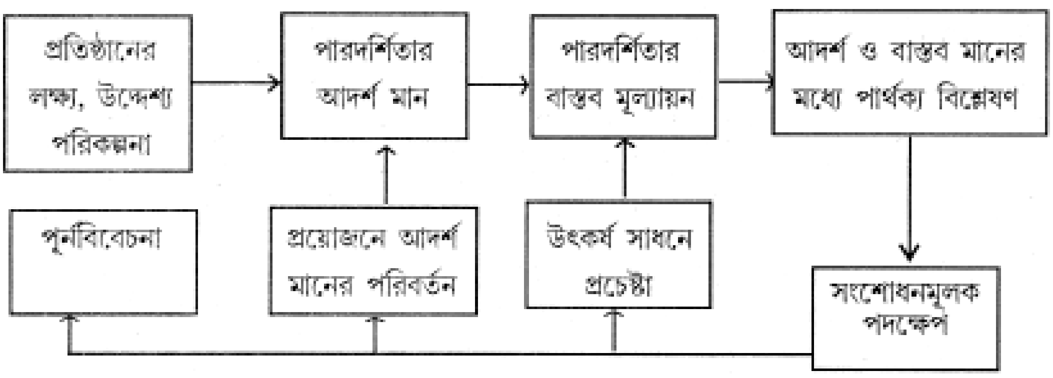

চিত্র ৯.১ : নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া

নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরগুলির আরও বিশদ ভাবে বর্ণনা করা যায়। যেমন,

— আদর্শ মান নির্ধারণ

— পারদর্শিতার বা সম্পাদিত কাজের পরিমাপ

— সম্পাদিত কাজ ও আদর্শমানের তুলনামূলক বিচার
— আদর্শ মান থেকে যে বিচ্যুতি হয়েছে তার সংশোধন
এই স্তরগুলি আরও পরিস্কার ভাবে বোঝানোর জন্য নিম্নের চিত্রটি অধিক সহায়ক।

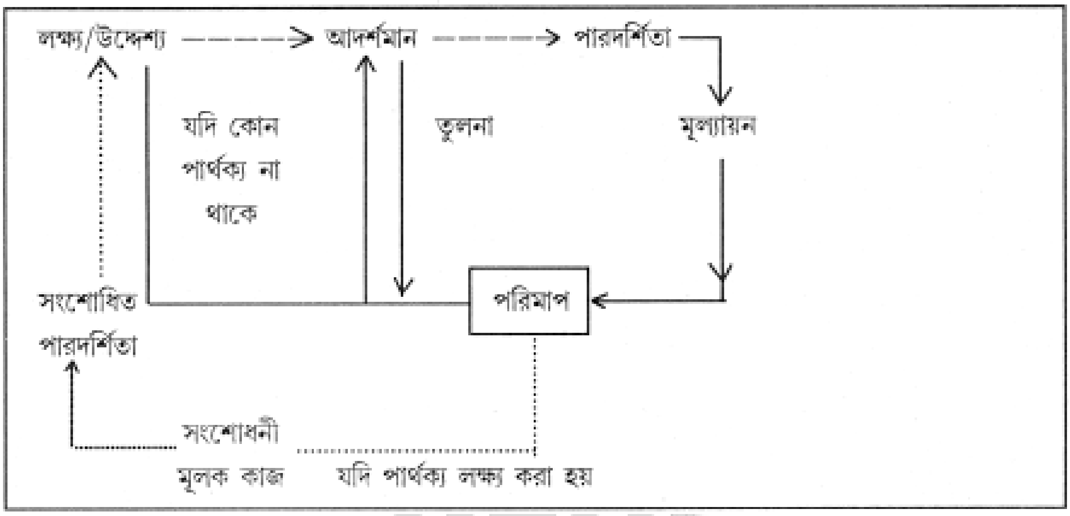

চিত্র ৯.২ : নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা

তবে এক্ষেত্রে সমস্যা হল শিক্ষা বিষয়ে আদর্শ মান নির্ধারণ করা সহজসাধ্য নয়। বিজ্ঞানসম্মত নীতি অনুসরণ করে বাস্তব অবস্থার কথা চিন্তা করে, নৈর্ব্যক্তিকভাবে আদর্শ মান গঠন করা উচিত। আদর্শমান নির্ধারণের অসুবিধা থাকলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যায় আদর্শমানের সূচকগুলি এই রকম—

— শিক্ষার্থীর সুষম বিকাশ।
— শিক্ষার্থীর পরীক্ষার ফলাফল।
— শিক্ষার্থীর নৈতিক ও সামাজিক বিকাশ।
— শিক্ষকদের পেশাগত উন্নতি ইত্যাদি।

শিক্ষার ব্যাপারে আদর্শমানকে সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা কঠিন বলে আদর্শমান ও সম্পাদিত কাজের মধ্যে তুলনা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

৯.২ শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রণের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র (Critical Areas of Control in Educational Management)

প্রশাসনিক বিভিন্ন কাজের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক কর্মসূচী। তাই প্রশাসনিক দায়িত্বের মধ্যে একটি দায়িত্ব হল নিয়ন্ত্রণ রক্ষা এবং সেই অনুযায়ী সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সাথে প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার সম্পর্ক বর্তমান। তাছাড়া নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াকে ফলপ্রসূ করার জন্য সঠিক

বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের বিনিময় করা প্রয়োজন। সবশেষে নিয়ন্ত্রণ করা তখনই সম্ভব যখন প্রশাসনের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে। এই প্রসঙ্গে শিক্ষা প্রশাসনে Line authority ও Staff authority-র উল্লেখ করা যায়। Line authority বলতে শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত উচ্চশ্রেণীর প্রশাসক, যেমন, শিক্ষামন্ত্রকের আধিকারিকরা, প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি বা প্রধান শিক্ষক ইত্যাদিকে বোঝায়। Staff authority-র অন্তর্গত হল অন্যান্য শিক্ষা কর্মচারী। অর্থাৎ Line authority-র নির্দেশিত পরামর্শে Staff authority বিভিন্ন উদ্দেশ্যমূলক কাজ করে থাকে। তবে একথা স্বীকার করা প্রয়োজন যে বাণিজ্য সংস্থার মত শিক্ষা ক্ষেত্রে Line বা Staff ক্ষমতার বিভাজন করা অনেক সময় সম্ভব হয় না।

৯.২.১ প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে (Areas of Institutional Control)

ম্যানেজমেন্ট বিজ্ঞানে বিভিন্ন ধরনের নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রের কথা বলা হয়ে থাকে যেগুলির সব কটি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করা যায় তা হল,

শিক্ষানীতি ও পরিকল্পনার উপর নিয়ন্ত্রণ (Control over Educational Policy and Planning)

শিক্ষানীতি ও পরিকল্পনার সার্থক রূপায়নের জন্য নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন। যেমন আমাদের দেশে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অথবা অনুন্নত শ্রেণীর বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি নীতিগুলির বাস্তব প্রয়োগের জন্য নিয়ন্ত্রণ থাকা একান্ত প্রয়োজন। সেই রকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নীতি ও নিয়মকানুনের উপরেও সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন নয়ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যগুলি কাজে পরিণত করা যাবে না।

শিক্ষণ প্রক্রিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ (Control over Teaching Process)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সব থেকে বেশি নিয়ন্ত্রণ রাখা প্রয়োজন শিক্ষণ প্রক্রিয়ার উপর। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিখন ও শিক্ষণ যদি মান অনুযায়ী না হয় তাহলে সেই প্রতিষ্ঠান নিজস্ব বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়। এই জন্য পাঠ্যক্রম, শিক্ষা পদ্ধতি, প্রদীপনের ব্যবহার, শৃঙ্খলা শ্রেণীকক্ষের ব্যবস্থাপনা (Classroom management) পরীক্ষা পদ্ধতি, ফল প্রকাশ ইত্যাদি কাজকর্মের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

বাজেট এবং আর্থিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ (Control over Budget and Financial Resource)

এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাজেট ও আর্থিক সম্পদের ব্যবহার খুব সর্তকতার সাথে করা উচিত। যদিও সরকারী বিদ্যালয় অথবা কলেজে বাজেট সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সীমিত (কারণ সরকারী অনুদানের উপরই প্রতিষ্ঠানগুলি নির্ভর করে) তবুও একথা বলা যায় বেসরকারীকরণের যুগে বাজেট ও আয়ব্যয়ের হিসাবের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখা সেই প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত।

গবেষণার উপর নিয়ন্ত্রণ (Control over Research)

শিক্ষার প্রসারে, শিক্ষার ক্রমাগত মান উন্নয়নে গবেষণার বিশেষ ভূমিকা আছে অতএব কি ধরনের গবেষণা হবে গবেষণার মান, অর্থ বরাদ্দ ও তার সর্বোচ্চ ব্যবহার ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে থাকা দরকার।

যোগাযোগ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ (Control Over Communication)

কার্যকরী প্রশাসন ও তত্ত্বাবধান অনেকাংশে নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ ব্যবস্থা বজায় রাখার উপর। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, শিক্ষকরা, ছাত্রছাত্রী, অশিক্ষক কর্মচারী ও শিক্ষা বিভাগের কর্মীদের সাথে নিয়মিত তথ্যের আদান প্রদান ছাড়া প্রশাসন ঠিকমত চলতে পারে না। তাই এই যোগাযোগ ব্যবস্থা যাতে সচল থাকে তার দিকে দৃষ্টি রাখা কর্তৃপক্ষের বিশেষ দায়িত্ব।

সামাজিক দায়বদ্ধতার নিয়ন্ত্রণ (Control of Social Accountability)

সবশেষে বলা যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হল একটি সামাজিক গোষ্ঠী ও বৃহত্তর সমাজের অংশ বিশেষ। অতএব সামাজিক দায়িত্ব পালন ঠিক মত হচ্ছে কিনা তার উপরেও নিয়ন্ত্রণ রাখার দরকার। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুস্থ সামাজিক আচরণ রাখার দরকার। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুস্থ সামাজিক আচরণ গড়ে তোলা, সামাজিক দায়বদ্ধতা শেখানো, ও নাগরিকতার শিক্ষা, পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব ইত্যাদি গুণের ঠিকানা এর জন্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে।

৯.৩ শিক্ষাক্ষেত্রে মান নির্ধারণকারী সংস্থা (Agencies of Control in Education)

শিক্ষাক্ষেত্রে মান নির্ধারণ করার দায়িত্ব কার এ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় শিক্ষার মান নির্ভর করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ইচ্ছার উপর অথবা বাইরের কোন সংস্থার বিচারের ক্ষমতার উপর (External agency) যে কোন প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে (Mission and goal) এবং প্রতিষ্ঠান সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে চলে অর্থাৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি নিজস্ব মূল্যায়নের সাহায্যে (Self evaluation) মান বজায় রাখার জন্য সক্রিয় থাকে। আবার বৃহত্তর ক্ষেত্রে অর্থাৎ সারা দেশের শিক্ষানীতি অনুযায়ী শিক্ষার মান বজায় আছে কি না তা দেখার জন্য কিছু বহিঃস্থ সংস্থাও থাকে। তাই শিক্ষার মান উন্নয়নের ব্যাপারে দুই ধরনের অভিমুখের (approach)-এর কথা উল্লেখ করা যায়।

— Self appraisal—সংস্থার নিজস্ব বিচার করণ

— External regulation—বহির্জগতের সংস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ।

কিছু কিছু এই ধরনের বিভাগের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন UGC-বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন যা কিনা সারা দেশের উচ্চ শিক্ষার প্রসার ও মান বজায় রাখা জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

AICTE — All India Council of Technical Education কারিগরী শিক্ষার তদারকির দায়িত্বে আছে এই সংস্থা।

NAAC— National Assessment and Accreditation Council উচ্চশিক্ষার তথা স্নাতকস্তরের শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণে এই কাউন্সিল কাজ করছে।

NCTE—National Council of Teacher Education—শিক্ষক শিক্ষণের ক্ষেত্রে এই কাউন্সিল বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। সেইসঙ্গে Medical Council of India (চিকিৎসাবিদ্যার শিক্ষার নিয়ন্ত্রণকারী)

Rehabilitation Council of India (প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণকারী) ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। এছাড়াও পেশাদারী শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন Association আছে যারা সবসময় নিজ নিজ ক্ষেত্রে শিক্ষার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখার জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

এ প্রসঙ্গে এই ধরনের দুটি সংস্থার বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হল।

৯.৩.১ NAAC

NAAC-এর পূর্ণ রূপ National Assessment and Accreditation Council.

NAAC একটি স্বশাসিত সংস্থা। UGC-এর তত্ত্বাবধানে ও 1994 সালে NPE (1986) এর সুপারিশ অনুযায়ী এই কাউন্সিলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। NAAC-এর প্রধান দুটি উদ্দেশ্য হল মূল্যায়ন (assessment) ও গুণমান ভিত্তিক স্বীকৃতি দান (accreditation) NAAC পারদর্শিতা ও গুণগত মানের কতগুলি সূচক নির্দেশ করেছে যার সাহায্যে বিভিন্ন উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন শ্রেণীতে (Category) ভাগ করা হয়।

NAAC-এর প্রধান কাজগুলি হল—

— নির্দিষ্ট সময় অন্তর উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিতে মূল্যায়ন ও গুণমানের ভিত্তিতে স্বীকৃতি দান করা।

— শিক্ষার মান, গবেষণার উন্নতি ও শিখন পদ্ধতির উন্নয়নের জন্য সঠিক পরিবেশ তৈরি করতে কলেজগুলিকে উৎসাহ প্রদান।

— দায়বদ্ধতা, নিজস্ব মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু করা, শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন নতুন পরিবর্তন ও স্বশাসন ব্যবস্থা প্রণয়নে উৎসাহ দান।

— মান উন্নয়নমূলক গবেষণার কাজে উৎসাহ দেওয়া

— উচ্চশিক্ষার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য সংস্থার সাথে সহযোগীতা করে মান নির্ধারণ করা।

NAAC-এর একটি বিশেষত্ব হল উচ্চশিক্ষার যে প্রতিষ্ঠানগুলি স্বেচ্ছায় নিজেদের মানের মূল্যায়ন করতে আগ্রহী, NAAC শুধু সেই প্রতিষ্ঠানগুলির মূল্যায়ন করে থাকে।

NAAC বিভিন্ন কার্যপ্রণালী সাধারণতঃ দুটি কমিটির দ্বারা সম্পাদিত হয়—এ দুটি হল GC বা .General Committee এবং EC বা Executive Committee এই কমটির সদস্যরা হলেন উচ্চস্তরের প্রশাসক, নীতি নির্দেশক ও উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রের অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ। NAAC-এর নিজস্ব কিছু Core Staff আছে তাছাড়াও মূল্যায়নের সময় পরামর্শদাতা ও বহিরাগত উপদেষ্টামণ্ডলীর সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে।

৯.৩.২ National Council of Teacher Education

1973 সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের প্রস্তাবে NCTE প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু 1993 সালে সংস্থাটি আইনসিদ্ধ হয়। এটিও একটি স্বশাসিত সংস্থা যার উদ্দেশ্য হল ভারতে শিক্ষকশিক্ষণের উন্নতি করা। 1993 সালের আইন অনুযায়ী এর বিভিন্ন কার্যাবলীগুলি হল—

— শিক্ষক শিক্ষণ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের অনুসন্ধান করা ও সেই সব তথ্য প্রকাশ করা।

— শিক্ষক শিক্ষণ ব্যাপারে কেন্দ্র, রাজ্য তথা UGC কে পরামর্শ দেওয়া।

— সারা রাজ্যব্যাপী শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থার সম্বন্ধে সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখা ও সমন্বয় সাধন করা।

— শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ন্যুনতম যোগ্যতা নির্ধারণ করা ও ছাত্রছাত্রীদের ন্যুনতম যোগ্যতা স্থির করা।

— শিক্ষক শিক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন কোর্সের সাধারণ নির্দেশগুলি তৈরী করা।

— এই শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে গবেষণা ও নতুন চিন্তাভাবনা প্রণয়নে উৎসাহিত করা।

— এই ব্যাপারে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা ও অনুদান দেওয়া।

— শিক্ষক শিক্ষণ যেন বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত না হয় যে ব্যাপারে যথাযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া

— শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

— এই শিক্ষণ সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রক্ষা করা।

NCTE ACT (1993) অনুযায়ী ভারতের সমস্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে NCTE' -র অনুমোদন নেওয়া বাধ্যতামূলক। অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের দেওয়া শিক্ষক শিক্ষণ ডিগ্রি আইনত গ্রাহ্য নয়।

শিক্ষক শিক্ষণের বিষয়ে সঠিক মান বজায় রাখার জন্য NCTE ডাকযোগে B. Ed. শিক্ষা বন্ধ করার চেষ্টা করে, আধুনিক শিখন পদ্ধতি ও পাঠক্রমের উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালায় এবং শিক্ষকদের পেশাদারী মনোভাব রক্ষা করার জন্য Code of professional ethics তৈরী করে।

৯.৪ শিক্ষায় মান নিয়ন্ত্রণ (Quality Control)

Quality বা উৎকর্ষ বা গুণ সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয় কোন বস্তু বা পরিষেবার মান ব্যাখ্যা করার জন্য। উৎকর্ষতা কথাটির বর্ণনা দেওয়া সহজ নয়, কারণ এটি একটি ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং অনেক সময় এর সর্বজনীন সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব হয় না, কারণ ব্যক্তি বিশেষে উৎকর্ষের মাপকাঠি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রে উৎকর্ষের পরিমাপ করা বা ধার্য করা অত্যন্ত জটিল কেন না শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি স্পর্শনাতীত (intangible) এবং সেই জন্য পরিমাপ করা সহজ নয়।

৯.৪.১ মান সম্বন্ধে ধারণা (Concept of Quality)

শিক্ষাক্ষেত্রে উৎকর্ষে সূচক নির্ণয় করতে গিয়ে পাশ্চাত্য দার্শনিকরা কতকগুলি লক্ষ্যের কথা বলেছেন। এগুলি হল—

— শিক্ষায় পরম উৎকর্ষ (Excellence in education) (Peters and Waterman 1982)

— এমন শিক্ষা ব্যবস্থা যা সঠিক মূল্য আরোপ করতে সাহায্য করে ((Value addition in education) (Feigenbaum 1983)

— শিক্ষান্তে অর্জিত দক্ষতা কাজে লাগানোর যোগ্যতা (Fitness of educational outcome & experience for use) (Juran 1988)

— শিক্ষান্তে যে দক্ষতা অর্জিত হয়েছে তা শিক্ষারম্ভের উদ্দেশ্যের অনুরূপ কিনা (Conformance of educational output to planned goals, requirement etc) (Crosby 1979)

— শিক্ষা প্রক্রিয়ার ত্রুটিগুলি পরিহার করা (Defect avoidance in education process) (Crosby 1979)

—শিক্ষার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তির শিক্ষা সম্বন্ধীয় চাহিদা ও আশাপূরণ (Meeting or exceeding customer's expectations of education) (Parasuraman 1985)

ভারতীয় দর্শনে উৎকৃষ্ট শিক্ষাকে তিনটি স্তরে বিভাজিত করা হয়েছে—সত্ব, তম ও রজ। আদর্শ শিক্ষা ব্যক্তিকে তামসিক থেকে রাজসিক ও সবশেষে সাত্বিক স্তরে আরোহন করতে সাহায্য করে। (মর্মর মুখোপাধ্যায় ২০০৫)। প্রোঃ মুখোপাধ্যায়-এর মতে শিক্ষার উৎকর্ষের সূচকগুলি হল—

— পারস্পরিক সম্পর্কের বৈশিষ্ট।

— সময়ানুবর্তিতা

— সর্বোত্তম পরিষেবা।

— উৎকর্ষের পরোক্ষ সূচক

— শিক্ষার সাথে জড়িত ব্যক্তির পরিষেবা সম্পর্কে অভিমত।

৯.৪.২ শিক্ষায় মান নিয়ন্ত্রণ (Quality Control of Education)

আগেই ৯.১ ও ৯.২ অংশে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির কথা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় যে কথাটি মনে রাখা দরকার তা হল নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া এমনভাবে চলবে যাতে শিক্ষার মান অথবা প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। মান বা উৎকর্ষ কোন রকম এককালীন ব্যাপার নয়। প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে সচারু রূপে কাজ করলেও প্রশাসন শিথিল বা শ্লথ হতে পারে না কারণ উৎকর্ষ বজায় রাখা একটি অবিরাম পদ্ধতি। এ প্রসঙ্গে ম্যানেজমেন্ট বিজ্ঞানে TQM বা Total Quality Management (সার্বিক গুণমান ব্যবস্থাপনা) এর ধারণার অবতারণা করা হয়েছে। এই ধারণা শিক্ষা ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হচ্ছে।

৯.৫ শিক্ষা ক্ষেত্রে সার্বিক গুণমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ (Application of Total Quality Management in Education)

Total Quality Management (TQM) এর মূল নীতি হল ব্যক্তিগত উন্নয়ন এবং প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ বিকাশের জন্য ব্যক্তি বিশেষের অবদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা। অবশ্য শিক্ষার সরঞ্জাম ও প্রযুক্তির ভূমিকাও স্বীকার করে নেওয়া হয়।

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের মতে (২০০৫) উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক গঠন (Institutional Building) অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি অংশের সর্বাঙ্গীন বিকাশ। এ ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানিক নেতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এর অর্থ হল প্রতিষ্ঠানের উৎকর্ষ নির্ভর করে প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠন ও সুদক্ষ নেতৃত্বের উপর। এখানে Building কথাটি ইমারত বোঝায় না বরং প্রতিষ্ঠান জড় ও মানবসম্পদের সম্পূর্ণ বৃদ্ধি ও বিকাশ এর ইঙ্গিত করে।

এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় লক্ষ্যগুলি উল্লেখ করা যায়।

— উৎকর্ষ অর্জনের প্রথম পদক্ষেপ হল প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পরিকল্পনা রচনা। প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে উৎসাহ, উদ্দীপনা জানিয়ে তাদের কাজে উজ্জীবিত করা।

— প্রশাসনিক বাধা যতদূর সম্ভব দূর করা।

— প্রয়োজন মত ঝুঁকি নিতে উৎসাহ দেওয়া।

— প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে নেতৃত্বের বিকাশ।

— শুধু প্রশাসনিক কাজে অংশগ্রহণ করা নয়। প্রত্যেক কর্মীর মধ্যে সৃজনশীলতার বিকাশে সাহায্য করা।

— TQM-এর মূল নীতিই হল প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি ব্যক্তিকে বিভিন্ন কাজে অন্তর্ভূক্ত করা, প্রয়োজনে ক্ষমতা প্রদান করা দরকার যাতে কর্মী নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

— TQM-এর আর একটি আবশ্যিক শর্ত হল নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ। যেহেতু ক্ষমতা হস্তান্তর করার প্রয়োজন তাই শিক্ষার সব স্তরেই যাতে সঠিক নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতার বিকাশ হয় তার চেষ্টা করা দরকার। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে বিশেষ সচেষ্ট হতে হবে। স্বল্প অভিজ্ঞ নেতা যদি কিছু ভুল পদক্ষেপও নেয় তবুও কর্তৃপক্ষ এমন কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না যাতে সেই ব্যক্তির মনে নিরাপত্তা বোধের অভাব দেখা যায়। অর্থাৎ বাঁধা ধরা রাস্তায় চললে আজকের পরিবর্তনশীল জগতে পিছিয়ে পড়তে হয় তাই নতুন পরিকল্পনা রূপায়নে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কোন কর্মী যদি উৎসাহের সাথে কাজ করতে চায় তাহলে তাকে যতদূর সম্ভব মানসিক সমর্থন দেওয়া দরকার না হলে কোন কর্মী ভবিষ্যত উন্নয়নমূলক কাজে সাহস পাবে না।

— এই বক্তব্যটির সাথে জড়িত আর একটি প্রয়োজন হল প্রত্যেক কর্মীকে সুযোগ দেওয়া। কারণ ক্ষমতা ও সুযোগ না দিলে বোঝা যায় না কার মধ্যে কি ধরনের সুপ্ত ক্ষমতা আছে।

— সবশেষে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক মানের উন্নয়নের জন্য প্রতিটি ব্যক্তির মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। অর্থাৎ তাদের সম্পাদিত কাজের, তাদের মানসিক সংলক্ষণের বিচারকরণ ও দরকার পড়লে নির্দেশনা বা Counseling এর সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন।

৯.৬ সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন (Performance appraisal)

যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন দুই ধরনের হতে পারে। যেমন প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কাজকর্মের মান নির্ণয় এবং তা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিচার করা আর দ্বিতীয়টি হল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মীর নিজস্ব কাজকর্মের বা পারদর্শিতার মূল্যায়ন করা। অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যায়ন থাকে সার্বিক মূল্যায়ন বলা যায় ও ব্যক্তিগত মূল্যায়ন অর্থাৎ প্রতিটি ব্যক্তি নিজস্ব ক্ষমতা অনুযায়ী সর্বোচ্চ উৎপাদন বা পরিষেবা দিতে পারছে কিনা। অবশ্য একথাও ঠিক যে এই দুই ধরনের মূল্যায়ন একে অপরের উপর নির্ভরশীল।

প্রাতিষ্ঠানিক মান বজায় রাখার জন্য যে সূচকের উল্লেখ করা যেতে পারে তা তিনটি শ্রেণীর উপর ভিত্তি করে করা যায়। এই তিনটি শ্রেণী হল Input বা যোগান, Process বা পদ্ধতি ও output বা উৎপাদন। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের এর মতে উন্নত মানের শিক্ষার পাঁচটি সূচক হল—

— শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর শৃঙ্খলাবদ্ধতা ও সময়ানুবর্তিতা।

— শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচ্ছন্নতা ও যথাযোগ্য রক্ষণাবেক্ষণ।

— উত্তম মানের শিক্ষামূলক পারদর্শিতা।

— উত্তম মানের সহশিক্ষামূলক পারদর্শিতা।

— উন্নত মানের প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ এবং শিক্ষাসংক্রান্ত কাজের সঙ্গো জড়িত ব্যক্তির সন্তুষ্টি বা পরিতৃপ্তি।

যেহেতু অনেক সময় উৎকর্ষের সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব হয় না তাই অনেক সময় সূচক বিভিন্ন ধরনের হতে পারে বলে মনে করা হয়। বিভিন্ন ম্যানেজমেন্ট বিশেজ্ঞরা মান নির্ণয়কারী সূচকের কথা উল্লেখ করেছেন যেগুলি শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়োগ সম্ভব। NAAC-এর আলোচনা প্রসঙ্গো আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব মূল্যায়ন, সহকর্মী দ্বারা মূল্যায়ন (peer review) প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত রিপোর্ট ইত্যাদি উৎকর্ষের সূচক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

এই প্রসঙ্গো বলা যায় যে কোন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান SWOT বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজস্ব ভালমন্দের খতিয়ান করতে পারে। SWOT বলতে বোঝানো হয়েছে—

S – Strength প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সামর্থ্য ও শক্তি কতখানি।

W – Weakness প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা কোথায়।

O – Opportunties প্রতিষ্ঠানের কি কি সুযোগ আছে।

T – Threat অর্থাৎ কোন অবস্থা বা পরিস্থিতি প্রশিক্ষণের পক্ষে হানিকারক বা কোন কোন দিক থেকে আশঙ্কার কারণ আছে।

এছাড়া ব্যক্তিগত পারদর্শিতার মান নির্ণয় করার জন্য যে সব সূচকের সাহায্য নেওয়া হয় তা মানবসম্পদের উন্নয়নের সঙ্গো জড়িত। এই ধরনের পরিমাপের উপায়গুলি হল নিম্নপ্রকার।

— কর্মীর সম্বন্ধে রিপোর্ট বা বর্ণনা। যে কোন প্রশাসক তার অধীনস্থ কর্মচারীর সম্বন্ধে রচনাধর্মী বর্ণনা দিতে পারেন। যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের যোগ্যতার একটি বিবরণ রাখতে পারেন।

— Critical incidents বা কর্মীর কাজের সঙ্গো সম্পর্কিত বিশেষ আচরণের বিবরণ। যেমন শিক্ষক শ্রেণী কক্ষে কি পদ্ধতি ব্যবহার করছেন অথবা পাঠদানের সময় তার আচরণে কি ধরনের বৈশিষ্ট দেখা যাচ্ছে তা লিপিবদ্ধ করা হয়। Micro teaching পদ্ধতিতে উল্লিখিত দক্ষতাগুলির সাহায্যেও শিক্ষনের দক্ষতা পরিমাপ করা সম্ভব।

— Graphic Rating Scale —এখানে শিক্ষকের বিভিন্ন কাজের একটি সূচী থাকে যেমন তিনি কটি ক্লাশ নেন তাঁর পড়ানোর মান, নিজস্ব বিষয়ে জ্ঞান, সহযোগীতা সততা, নিয়মানুবর্তিতা কর্মোদ্যোগ ইত্যাদি। এক্ষেত্রে রেটিং-এর সাহায্যে শিক্ষকের কর্মদক্ষতা পরিমাপ করা হয়।

— Multiperson Comparison —এখানে এক ব্যক্তি বা কর্মীর মূল্যায়ন বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা করা হয়ে থাকে। যেমন কোন শিক্ষকের মূল্যায়ন প্রধান শিক্ষক অন্যান্য সহকর্মী শিক্ষক এমনকি শিক্ষার্থীরাও করতে পারে। এই ধরনের মূল্যায়ন থেকে তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ করা যায়।

তবে ব্যক্তিগত মূল্যায়নের সময় মনে রাখতে হবে প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ এমন হওয়া উচিত যাতে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গো যুক্ত কর্মীরা সৃজনীমূলক কাজ করার স্বাধীনতা ও উৎসাহ পায়। কারণ কাজের পরিবেশ উপযুক্ত না হলে কোন ব্যক্তির সঙ্গো তার কর্মক্ষেত্র বা কর্মপ্রতিষ্ঠানের একাত্মতা গড়ে ওঠে না। ফলে সেই কর্মীর কাজে অনীহা

দেখা যায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শিক্ষকের সাথে বিদ্যালয়ের এবং শিক্ষার্থীদের যদি মধুর সম্পর্ক না তৈরী হয় তাহলে শিক্ষা দান কাজটি ব্যহত হবার সম্ভাবনা।

৯.৭ সারসংক্ষেপ (Summary)

যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্যপূরণের জন্য নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া কয়েকটি ধাপে কার্যকর করা হয়। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য সম্বন্ধে পরিকল্পনা করা, পারদর্শিতার আদর্শমান স্থির করা, পারদর্শিতায় বাস্তব মূল্যায়ন, আদর্শ ও প্রকৃতমানের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা, সংশোধনমূলক পদক্ষেপ নেওয়া, উৎকর্ষ সাধনের প্রচেষ্টা ইত্যাদি এই ধাপগুলির অন্যতম। শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রগুলি হল, শিক্ষানীতি ও পরিকল্পনার উপর নিয়ন্ত্রণ। শিক্ষণ প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ, বাজেটে এবং আর্থিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ, গবেষণার উপর নিয়ন্ত্রণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার নিয়ন্ত্রণ। নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে দুই প্রকার কর্তৃত্বের কথা বলা হয়ে থাকে—Line authority এবং Staff authority এবং Staff authority। এর মধ্যে Line authority' হল উচ্চতর নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃত্ব। এবং Staff authority-র অর্থ কর্মীদের কর্তৃত্ব। এই দুই প্রকার কর্তৃত্বের মধ্যে ক্ষমতা সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে সঠিক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। প্রথমটির হাতে অধিক ক্ষমতা থাকলে কঠোর নিয়ন্ত্রণ এবং দ্বিতীয়টির হাতে বেশি ক্ষমতা থাকলে নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষতঃ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র মান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশে National Assessment and Accredition Council (NAAC), National Council of Teacher Education (NCTE), All India Council of Technical Education (AICTE) Medical Council of India (MCI) ইত্যাদি এই জাতীয় সংস্থার উদাহরণ।

শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রথমে জানার দরকার। বিশেষজ্ঞরা এসম্বন্ধে কয়েকটি লক্ষ্যের কথা বলেছেন। যেমন, শিক্ষার পরম উৎকর্ষ, শিক্ষায় উপযুক্ত মূল্য আরোপ, শিক্ষান্তে অর্জিত দক্ষতা কাজে লাগানোর যোগ্যতা, উদ্দেশ্য ও অর্জিত লক্ষ্যের সামঞ্জস্য, ত্রুটি এড়ানোর ক্ষমতা, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির চাহিদা ও আশা পূরণ ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে শিক্ষায় সার্বিক গুণমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা বা Total Quality Management (TQM) এর কথা বলা হয়েছে। কয়েকটি সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের সাহায্যে TQM কার্যকর করা সম্ভব। সবশেষে সম্পাদিত কাজের যথাযথ মূল্যায়ন না হলে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং TQM কোনটাই কার্যকর করা সম্ভব নয়।

৯.৮ প্রশ্নাবলী

(১) নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিটি চিত্র সাহায্যে বর্ণনা করুন।
(২) NAAC এবং NCTE কার্যাবলী সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করুন।
(৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রগুলি কি কি?
(৪) TQM বলতে কি বোঝায়? TQM-এর নীতিগুলি কিভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়?
(৫) মান নির্ণয়ের সূচকগুলি কি কি? ব্যক্তির পারদর্শিতার মূল্যায়ন কিভাবে করা যায়?

একক ১০ ❑ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিকাশ (Development of Educational Organisation)

গঠন (Structure)

প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

১০.১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিকাশ

১০.২ পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশের সামঞ্জস্য

১০.২.১ পরিবর্তনে বাধা আসার কারণ

১০.২.২ কিভাবে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনা যায়

১০.৩ দ্বন্দ্বের মীমাংসা

১০.৩.১ বিভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্ব

১০.৩.২ দ্বন্দ্বের কারণ

১০.৩.৩ দ্বন্দ্বের নিরসন

১০.৪ মানব সম্পদের বিকাশ

১০.৫ মানব সম্পদের প্রশিক্ষণ

১০.৬ সারসংক্ষেপ

১০.৭ প্রশ্নাবলী

প্রস্তাবনা (Introduction)

যে কোন প্রতিষ্ঠানের উন্নতি নির্ভর করে বিভিন্ন উপাদানের উপর। আগের এককে কিভাবে উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা যায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ ও অগ্রগতির সাথে বিশেষভাবে জড়িত একটি উপাদান হল দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থা। এই পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে গেলে প্রতিষ্ঠানটিকে গতিশীল হতে হবে। পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন করে কিভাবে চলতে হবে সে সম্বন্ধে প্রশাসনিক জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। যে কোন প্রতিষ্ঠানে অর্ন্তদ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী। কিভাবে এই দ্বন্দ্বের মমাংসা করা যায়, প্রশাসকের জানা থাকা প্রয়োজন। তাছাড়া এই ধরনের মনোমালিন্য প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতিকে ব্যহত করতে পারে। তাই দ্বন্দ্ব এড়ানো বা সমাধান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর একটি প্রয়োজনীয় অংশ হল কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও উত্তোরত্তর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি। কারণ প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি নির্ভর করে দক্ষ কর্মীদের উপর। এই জন্য মানবসম্পদের বিকাশ ও প্রশিক্ষণ এই দুটি বিষয়কে এই এককে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য (Objective)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিকাশ সম্বন্ধে ধারণা দিতে পারবেন।
- কি ভাবে পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন আনতে হয় সে সম্বন্ধে বিবরণ দিতে পারবেন।
- পরিবর্তনের বাধাগুলি সম্বন্ধে জানতে পারবেন।
- পরিবর্তন প্রক্রিয়া কিভাবে সম্পন্ন হয় বলতে পারবেন।
- প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্ব ও তার কারণ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- দ্বন্দ্বের নিরসন পদ্ধতি সম্বন্ধে ধারণা লাভ করবেন।
- প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় মানব সম্পদের বিকাশ ও প্রশিক্ষণ সম্বন্ধে অবহিত হবেন।

১০.১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিকাশ (Institutional Development)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিকাশের উদ্দেশ্য হল কি ভাবে প্রতিষ্ঠানটির দক্ষতা ও কর্মকুশলতা বৃদ্ধি করা যায়। প্রতিষ্ঠানের বিকাশ নির্ভর করে দুটি বিষয়ের উপর।

— বাহ্যিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজস্ব বিকাশ সুনিশ্চিত করা।

— প্রতিষ্ঠানটি আভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান কিভাবে করছে তার উপরেও এটির অগ্রগতি নির্ভরশীল।

অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ ও উন্নয়ন তখনই সম্ভব যখন বাহ্যিক পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিষ্ঠানটি তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণ করে আবার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও সমস্যার মোকাবিলা করে সামগ্রিক উন্নতির ধারা বজায় রাখতে পারে। আরও বলা যায় যে প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ হল পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিবর্তন এর সাহায্যে অগ্রগতি সুনিশ্চিত করা। এ প্রসঙ্গে প্রথমে পরিবর্তন ও প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ এই নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন।

১০.২ পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশের সামঞ্জস্য (Management of Charge)

পরিবর্তনশীলতা জীবনের ধর্ম। বহির্জগতে যে সদা পরিবর্তন তার সাথে যদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান না মানিয়ে চলতে পারে তাহলে তার অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে উঠবে। পরিবর্তনের ধারা নিম্নলিখিত উপাদানগুলির মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয়। এগুলি হল অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত ও সামাজিক পরিবর্তন।

প্রথমতঃ অর্থনৈতিক পরিবর্তন শিক্ষাজগতকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে। বর্তমান যুগে বাজার অর্থনীতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তথা সরকারী শিক্ষানীতির মধ্যে বিশেষ পরিবর্তন আনতে বাধ্য করেছে। শিক্ষার উচ্চস্তরে

সরকারী অনুদান হ্রাস হওয়ার সম্ভাবনা দেখা গেছে। বেসরকারী শিক্ষা সংস্থার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারীকরণের প্রবণতা লক্ষিত হচ্ছে। এই অবস্থার সাথে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা প্রাচীনপন্থী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি নিজেদের কার্যাবলীর মধ্যে প্রয়োজনীয় পরবির্তন না আনতে পারে এবং চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা না করতে পারে তাহলে তার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠবে, অগ্রগতি ত' দূরের কথা।

দ্বিতীয়তঃ প্রযুক্তিগত পরিবর্তনও শিক্ষাব্যবস্থার উপর বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। নতুন প্রযুক্তিভিত্তিক শিখন পদ্ধতি, দূরাগত শিক্ষা, on-line শিক্ষা, শিক্ষাক্ষেত্রে বিশ্বায়ন এই সবই নতুন নতুন প্রযুক্তির প্রভাবের ফল। এখানেও এই নতুন পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি যদি অভিযোজন করে চলতে না পারে তাহলে তাদের পক্ষে প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

তৃতীয়তঃ সামাজিক পরিবর্তন শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে বাধ্য করে। আধুনিক যুগের যে চিন্তাধারা যেমন গণতান্ত্রিক নীতি, সামাজিক চেতনা, বৃদ্ধি, শিক্ষায় সম সুযোগ, অনুন্নত শ্রেণীর জন্য বিশেষ শিক্ষা, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও সেই অনুযায়ী শিক্ষা, মানবিকতা ইত্যাদি বিষয়গুলি শিক্ষাব্যবস্থার প্রভুত পরিবর্তন এনেছে। প্রাচীন ধ্যান-ধারণার পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। এ প্রসঙ্গে রাজনৈতিক পরিবর্তনের কথাও মনে রাখতে হবে। শিক্ষানীতির মধ্যে রাজনৈতিক মতবাদের প্রতিফলন দেখা যায় এবং পরিবর্তিত রাজনৈতিক পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষানীতিও পরিবর্তিত হয়। এছাড়াও শিক্ষার উপর যে উপাদানগুলির প্রভাব আসতে পারে তা হল—

— সরকারের শিল্পনীতি।

— সরকারের অর্থনীতি।

— সরকারের বাণিজ্যনীতি।

আগেই বলা হয়েছে যে বাজার অর্থনীতির প্রভাব শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছে। Trade policy বা বাণিজ্য নীতির ব্যাপারে GATT (General Agreement on Trades and Tariff) চুক্তির কথা উল্লেখ করা যায়। GATT চুক্তির দরুণ শিক্ষা পরিষেবা একটি পণ্যে পরিণত হয়েছে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সব নতুন চাহিদার সৃষ্টি হচ্ছে তার সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি মানিয়ে চলতেই হবে। GATT চুক্তি কিছু নতুন সুযোগ এনেছে যেমন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা বিদেশে রপ্তানি করার সম্ভাবনা দেখা গেছে। এর পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে গেলে ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিশ্বমানের পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষায় বিশ্বায়ন যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে তা হল Quality বা উৎকর্ষতার চাহিদা। বাজার অর্থনীতিতে প্রয়োজন সুদক্ষ কর্মী। যে শিক্ষাসংস্থানগুলি এই ধরনের কর্মীর প্রশিক্ষণ দিতে পারছে না তাদের পক্ষে প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করা সম্ভবই নয়। তাই যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আধুনিক প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা দিতে পারছে না তাদের জনপ্রিয়তা ক্রমশঃ নিম্নমুখী। সরকারী ও আধাসরকারী শিক্ষালয়গুলিকে বেসরকারী সংস্থার সাথে পাল্লা দিতে হচ্ছে। এই পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি যদি পদক্ষেপ না নিতে পারে তাহলে তারা অসুবিধায় পড়তে বাধ্য।

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নীতি অনুসারে উচ্চশিক্ষাকে ততখানি গুরুত্ব দেওয়া হবে না বলে ঘোষণা করা হয়েছে। (non merit subject) এই পরিবর্তন আমাদের উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারীকরণের প্রবণতা আসতে বাধ্য করছে।

১০.২.১ পরিবর্তনে বাধা আসার কারণ (Causes of obstacles to Change)

K. Davis তাঁর Human Behaviour at work গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে বিশেষ কতকগুলি কারণে কর্মীরা পরিবর্তনের বিরোধিতা করে থাকে। যেমন পরিবর্তন আনার জন্য সময় দরকার, নতুন করে শেখা দরকার। তাছাড়া পরিবর্তন পুরোনো দক্ষতাকে অপ্রয়োজনীয় করে তোলে, পরিবর্তন করতে গেলে খরচ বৃদ্ধি হয়; এবং অনেক সময় মনে করা হয় পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নেই। এই সব যুক্তিমূলক কারণে কর্মীরা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ পরিবর্তন আনতে রাজী হয় না।

পরিবর্তনের বিরুদ্ধে মনোবৈজ্ঞানিক কারণগুলি হল পরিবর্তন বিরোধী মানসিকতা (Change resistance) অজানার প্রতি আশঙ্কা, পরিবর্তন সহ্য করতে না পারা, ইত্যাদি। অপরিবর্তিত বা বর্তমান অবস্থা এক ধরনের নিরাপত্তার বোধ দেয় যার ফলে প্রশাসন পরিবর্তন এর সাহায্য নতুন কোন ঝুঁকি নিতে চায় না।

সামাজিক বা রাজনৈতিক কারণে অনেক সময় পরিবর্তনে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। স্থানীয় সংকীর্ণ মনোভাব, কিছু কিছু কর্মীর ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের বিচার, কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের বিশেষ সুবিধা বজায় রাখার প্রতি আগ্রহ ইত্যাদি কারণেও প্রতিষ্ঠানগুলি নতুন কিছু করতে আগ্রহ দেখায় না।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তন বিরোধী যে উপাদানগুলি উল্লেখযোগ্য তা যুক্তিমূলক, মনোবৈজ্ঞানিক ও সামাজিক রাজনৈতিক সব ধরনেরই হতে পারে। প্রশাসনিক নীতি, পাঠক্রম, মূল্যায়ন ব্যবস্থা, নতুন বিষয়ে সংযোজন বা পুরানো কিছুর বর্জন, ইত্যাদি যে কোন ক্ষেত্রেই পরিবর্তন বিরোধিতা দেখা যায়।

১০.২.২ কিভাবে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনা যায় (How to bring about desired change)

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক অসুবিধার জন্য উন্নয়ন আনা সম্ভব হয় না। যেমন প্রতিযোগীতার বাজারে প্রতিষ্ঠানের উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, প্রয়োজনীয় শিক্ষামূলক সামগ্রী ও সরঞ্জাম কেনা দরকার, লাইব্রেরী ও পরীক্ষাগারের উন্নতি দরকার, —এই সব ব্যাপারেই অর্থের সাহায্য ছাড়া কোন কাজ এগোতে পারে না। তাই সরকারের তরফ থেকে যথেষ্ট সাহায্য না পেলে কাঙ্খিত পরিবর্তন আনা দুরূহ ব্যাপার।

অন্যদিকে সাধারণতঃ দেখা যায় যে ব্যক্তি নিজেও অনেক সময় পরিবর্তন বিরোধী। তার কারণগুলি হল—

— নতুন পরিস্থিতি সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা।

— পুরোনো অভ্যাস ছাড়ার অসুবিধা।

— পরিবর্তনের সাথে ব্যক্তিগত ক্ষতির সম্ভাবনা বা আশঙ্কা।

— এবং অনেক সময় ব্যক্তির বিশ্বাস যে প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে শুভ হবে না।

প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তন কিভাবে আনা যায় এ প্রসঙ্গে Robbins ও Coulter (2005) তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং ছয়টি কর্মপন্থার কথা বলেছেন। এগুলি হল—

— শিক্ষার প্রসার ও সংযোগ রক্ষা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কে জানাতে হবে কেন পরিবর্তন প্রয়োজন, এর জন্য মুখোমুখি আলোচনা, দলগত আলোচনা, রিপোর্ট তৈরী করা এবং যুক্তি সহকারে সকলকে পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বোঝানো।

— যার পরিবর্তন বিরোধী তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিতে উৎসাহী করা। অংশগ্রহণের ফলে বিরোধিতা করার প্রবণতা কমে এবং উৎসাহ ও দায়িত্ব নেবার ইচ্ছা হয়।

— যারা পরিবর্তনে আগ্রহী তাদের সবরকম সাহায্য ও সমর্থন দেওয়া অথবা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, যাতে নতুন কিছু করতে গিয়ে তাদের মধ্যে আশঙ্কা বা উদ্বেগের সৃষ্টি না হয়।

— পরিবর্তন আনার জন্য প্রয়োজন হলে প্রশাসক মণ্ডলীকে আপোষ, মীমাংসা বা কিছু রফা করা দরকার। দরকার হলে কিছু কিছু আর্থিক সাহায্যও দেওয়া যেতে পারে।

— কখনও কখনও পরিবর্তন আনার খাতিরে কপটতার আশ্রয় নিতে হয়।

— সবশেষে প্রয়োজন মত প্রশাসনিক পরিবর্তন আনতে বল প্রয়োগ করতেও পারে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও ম্যানেজিং কমিটির দায়িত্ব হল এই পরিবর্তন আনার জন্য সুদক্ষ নেতৃত্ব দান। এ কথা মনে রাখা দরকার যে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের একটি নিজস্ব কৃষ্টি বা Culture থাকে যা পরিবর্তন করা কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু নতুন চিন্তা ভাবনা আনতে হলে কৃষ্টির পরিমার্জন ও পরিবর্ধন দরকার।

১০.৩ দ্বন্দ্বের মীমাংসা (Resolution of Conflicts)

দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক ভাবেই জীবনের অঙ্গ। যেহেতু ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য আছে চিন্তা ভাবনা মনোভাবের মধ্যে অনেক সময় সামঞ্জস্য থাকে না ফলে প্রাতিষ্ঠানিক দ্বন্দ্ব এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তবে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশাসনে এই দ্বন্দ্বকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হয়ে থাকে। এর ফলে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও পরিনমন বৃদ্ধি পায়। প্রাতিষ্ঠানিক দ্বন্দ্বের সুবিধা হল এর সাহায্যে বিশ্লেষণ মূলক চিন্তা ভাবনা করা সম্ভব হয়। এ প্রসঙ্গে H. Carlisle বলেছেন যে No situation in more detrimental to an organisation than letting poor decision go unchallenged. অর্থাৎ দুর্বল সিদ্ধান্তের বিরোধিতা না করলে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। দ্বন্দ্বের ফলে প্রতিষ্ঠানে চিন্তাভাবনার পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্য কিন্তু একাত্মতা বোধেরও সৃষ্টি করে। যেমন দুটি বিরোধী প্রতিষ্ঠানের দ্বন্দ্ব নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্যও একাত্মতা বোধ জাগিয়ে তোলে।

এছাড়া দ্বন্দ্বের সাহায্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের সৃষ্টি হয় যা প্রেষণার সৃষ্টি করে প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতিতে সাহায্য করে।

সবশেষে বলা যায় মত পার্থক্যের প্রকাশের সাহায্যে অন্তর্নিহিত মনোবৈজ্ঞানিক চাপ, আশঙ্কা ও উদ্বেগ কম হতে পারে।

১০.৩.১ বিভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্ব (Different Types of Conflict)

যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্ব থাকতে পারে। এ গুলি হল নিম্নপ্রকার—

— ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দ্বন্দ্ব। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের দ্বন্দ্ব খুবই স্বাভাবিক। যেমন প্রধান শিক্ষক সহকারী প্রধান শিক্ষকের মধ্যে মতানৈক্য অথবা এক শিক্ষকের সঙ্গে অপর শিক্ষকের তীব্র বিরোধিতা, প্রতিষ্ঠানে অনেক সময় সমস্যার সৃষ্টি করে।

— ব্যক্তি বিশেষ ও দলের মধ্যে বিরোধ। যেমন, প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষকদের বিরোধ।

— দুই দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত বিভিন্ন উপদল ও দলে এ মতভেদ দেখা যায়। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে মনোমালিন্য লক্ষ্য করা যায়।

— দুই বা ততোধিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দ্বন্দ্ব। যেমন দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিরোধীতা হতে পারে অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসন সংস্থার মধ্যেও দ্বন্দ্ব দেখা যায়। যেমন, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের বিরোধ।

১০.৩.২ দ্বন্দ্বের কারণ (Causes of Conflict)

দ্বন্দ্বের মীমাংসার জন্য এর কারণগুলি সম্বন্ধে কিছু জানা থাকা একান্ত দরকার।

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রতিম্যান (Attitude) অনুভূতি প্রক্ষোভ মূল্যবোধ ও পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা আলাদা বলেই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। অনেক সময় ঠিকমত যোগাযোগ না হওয়ার জন্য সঠিক বার্তা এসে পৌঁছায় না যার ফলে ভুল বোঝাবুঝি হয়ে থাকে। তাছাড়া ব্যক্তিগত ধর্ম, জাতিভেদ ইত্যাদির কারণেও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। মহিলা কর্মীদের অনেক সময় কুসংস্কারের শিকার হতে হয়।

দ্বন্দ্ব সৃষ্টির আর একটি কারণ হল ঠিক কি কি কাজ করতে হবে এ সম্পর্কে স্বচ্ছতার অভাব। প্রত্যেক কর্মীর নিজস্ব কাজের বর্ণনা ও তার ঠিক কি ভূমিকা এই সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা না থাকলেই সমস্যার সৃষ্টি হয়। Kahn (1983) তাঁর বই Work and Health এ বলেছেন যে if these activities are ill defined then the person who in carrying out these activities will not behave as others expect him to behave as his role is not clearly defined (যদি এইসব করণীয় অস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয় তবে যে ব্যক্তি ঐ কাজ সম্পন্ন করবে তার আচরণ অন্যদের প্রত্যাশা মত হবে না কারণ তার ভূমিকা কি তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি)। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই দ্বন্দ্ব খুব স্বাভাবিক, কোন শিক্ষক ক'টি ক্লাস নেবেন, পাঠক্রমের কোন অংশটি পড়াবেন, পরীক্ষা সংক্রান্ত দায়িত্ব কি হবে, আর কোন কোন প্রশাসনিক কাজ তাকে করতে হবে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে অনেক সময় মতভেদ সৃষ্টি হয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনেক সময় বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্মগুলিকে সমন্বিত করা হয় না ফলে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় যেমন সময় তালিকা, পাঠক্রম সহ পাঠক্রমিক কাজকর্ম, মূল্যায়ন ইত্যাদি কাজের মধ্যে যোগসূত্র না থাকলেই সমস্যার উদ্ভব হবে। যদি একটি প্রশাসনিক দপ্তর, মনে করে অপর দপ্তরের সিদ্ধান্ত তাদের পক্ষে সমস্যাজনক অথবা, এক দপ্তরের ভুলভ্রান্তির জন্য অপর দপ্তরকে আংশিক দায়ী করার চেষ্টা হয় তখন, প্রশাসনিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হতে পারে।

১০.৩.৩ দ্বন্দ্বের নিরসন (Resolution of Conflict)

আগেই বলা হয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক দ্বন্দ্ব দুই প্রকারের এক ধরনের দ্বন্দ্ব যা প্রতিযোগীতামূলক এবং সৃজনশীল আর এক ধরনের দ্বন্দ্ব যা প্রতিষ্ঠানের কাজে বাধা দেয়। দ্বিতীয় প্রকার দ্বন্দ্বের নিরসন হওয়া খুবই জরুরী। দ্বন্দ্বের নিরসনের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

— লক্ষ্য সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা (Clear Concept of goal) — প্রতিষ্ঠানের কি লক্ষ্য এবং প্রত্যেক বিভাগের কি কি দায়িত্ব এগুলি পরিষ্কারকরে সকলকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজস্ব কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত থাকবে তাহলে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ কম হবে।

— আস্থা ও বিশ্বাসযোগ্যতা (Trust and credibility)—পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতা ও আস্থার

মনোভাব গঠন করার চেষ্টা করা উচিত। এছাড়া কর্মীদের মধ্যে খোলাখুলি সংযোগ থাকা দরকার, যাতে তারা নিজেদের ও অপরের সমস্যা সম্বন্ধে জানতে পারে ও পরস্পরকে সাহায্য করতে পারে।

— সমন্বয় সাধন (Coordination)—প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় বা সংহতি সাধন সম্ভব হলে দ্বন্দ্বের ঘটনা অনেকাংশে কমে যায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের দায়িত্ব হল বিভিন্ন বিভাগ ও বিভিন্ন কাজকর্মের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা যাতে চিন্তাভাবনার আদান-প্রদান নিয়মিত ভাবে হতে থাকে।

১০.৪ মানবসম্পদের বিকাশ (Human Resource Development)

যে কোন প্রতিষ্ঠানের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হল মানব সম্পদ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একথা আরো বেশি সত্য কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল Input বা জোগান হল শিক্ষক ও শিক্ষার্থী। এই মানবসম্পদের বিকাশ যদি ঠিকমত না হয় তাহলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

মানবসম্পদ বিকাশের প্রক্রিয়াটির কতগুলি স্তর আছে সেটি নীচের চিত্রের সাহায্যে দেখানো হল—

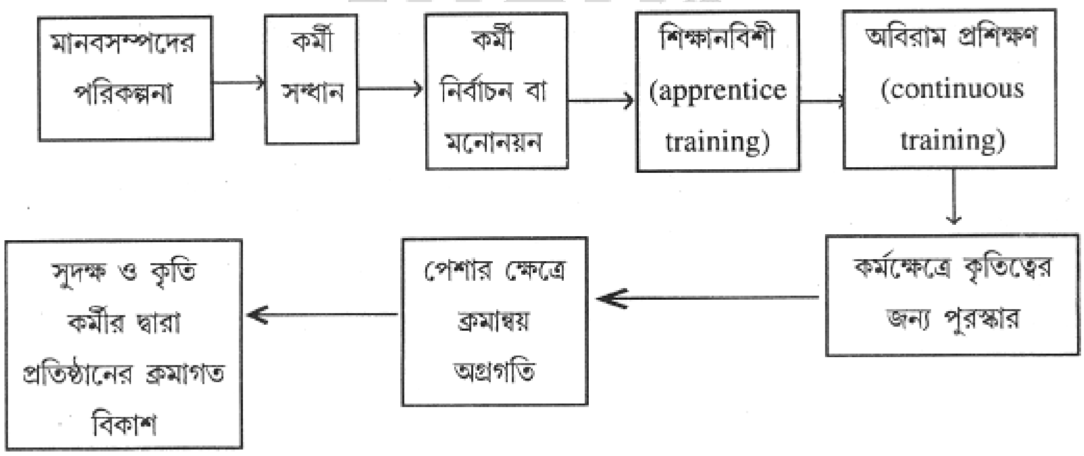

চিত্র ১০.১ মানবসম্পদ বিকাশের প্রক্রিয়া

উপরের চিত্রে দেখা যাচ্ছে মানবসম্পদ বিকাশের প্রথম স্তর হল পরিকল্পনা অর্থাৎ অর্থনীতির মানদণ্ডে কোন ধরনের সুদক্ষ কর্মী প্রয়োজন তা নির্ধারণ করা। যেমন শিক্ষাক্ষেত্রে বলা যায় যে শিক্ষার কোন স্তরের জন্য কতজন শিক্ষক প্রয়োজন, এবং কোন কোন বিষয়ের জন্য কত সংখ্যক শিক্ষক প্রয়োজন, ছাত্র সংখ্যার বৃদ্ধি কি পরিমাণে হচ্ছে কোন বিষয়ে ছাত্রাধিক্য বেশি ইত্যাদি বিষয়ের ঠিকমত বিশ্লেষণ না হলে পরিকল্পনা সঠিক হবে না।

নির্বাচন করার সময় অনেক ধরনের প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় যেমন, লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউ, কোন বিশেষ দক্ষতার প্রদর্শন (demonstration) ইত্যাদি। Orientation বা কর্মক্ষেত্রের পারিপার্শ্বিকের সাথে নিজেকে

পরিচিত করানোর প্রয়োজন যাতে কর্মী নিজেকে সেই প্রতিষ্ঠানের সাথে বা প্রতিষ্ঠানের কৃষ্টির সম্বন্ধে জানতে পারে ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে পারে।

১০.৫ মানবসম্পদের প্রশিক্ষণ (Training of Human Resource)

মানবসম্পদের বিকাশের প্রক্রিয়ায় তৃতীয় স্তরে যে কথা বলা হয়েছে তা হল প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। শিক্ষাক্ষেত্রে দুই ধরনের প্রশিক্ষণ হতে পারে—শিক্ষকতার শুরু করার আগে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত থাকাকালীন প্রশিক্ষণ। কর্মে নিযুক্ত থাকাকালীন শিক্ষা বা in service training বিভিন্ন হতে পারে যেমন, প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করে অভিজ্ঞতা বাড়ানো, অভিজ্ঞ শিক্ষক অপেক্ষাকৃত কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষককে সাহায্য করে থাকেন (mentoring) হাতে কলমে শেখানো, তাছাড়া শিক্ষণ সম্পর্কিত বিভিন্ন বই বা Manual এর সাহায্যে শিক্ষকের দক্ষতা বৃদ্ধি ইত্যাদি। এছাড়া গ্রীষ্মকালীন অবসরের সময় প্রশিক্ষণ, Refresher Course স্বল্প সময়ের জন্য নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে পরিচয় করানো, ওয়ার্কশপ, সেমিনারের কথাও উল্লেখ করা যায়।

সবশেষে শিক্ষকদের পাঠক্রমিক জ্ঞান, শিক্ষা পদ্ধতির উন্নতি ও শিক্ষামূলক সমস্যার সমাধানের জন্য বিভিন্ন ধরনের গবেষণা সংক্রান্ত লেখা প্রকাশ করতে অথবা গবেষণা ভিত্তিক পত্রিকা পড়তে উৎসাহ দেওয়া হয় যাতে তারা নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে উত্তরোত্তর পারদর্শী হয়ে ওঠেন।

চাকুরী ক্ষেত্রে নিরাপত্তার অনুভূতির সাথে কাজ করার ইচ্ছা বা প্রেষণার যোগ আছে। তাই শিক্ষকের বেতন, প্রোমোশন ও ছুটি ইত্যাদির ব্যবস্থা যদি নিয়মানুযায়ী না হয় তাহলে তাদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং শিখন কাজে বাধা পড়ে। তাই শিক্ষকের উৎসাহ, উদ্দীপনা ও কাজের ইচ্ছার সাথে এই বিষয়গুলির সম্পর্ক আছে বলে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে এই দিকে দৃষ্টি দিতে হয় ও সর্বদা শিক্ষকের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে হয়।

১০.৬ সারসংক্ষেপ (Summary)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিকাশ কথাটির অর্থ এর দক্ষতা ও কর্ম কুশলতা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের সাহায্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ঘটানো যায়। যে পরিবেশে প্রতিষ্ঠানটি সংগঠিত হয়েছে সেই পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গো সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিরও পরিবর্তন ঘটানো দরকার। না হলে প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব বজায় রাখা দুরূহ। তিন প্রকার পরিবর্তনের কথা বিশেষভাবে চিন্তা করা দরকার। সেগুলি হল, প্রযুক্তিগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন। রাজনৈতিক পরিবর্তনও অনেক সময় প্রতিষ্ঠানের উপর প্রভাব বিস্তার করে কারণ রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গো সরকারের অর্থনীতি, শিল্পনীতি ও বাণিজ্য নীতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন প্রায়শঃই নানা বাধার সম্মুখীন হয়। প্রধান বাধা আসে প্রতিষ্ঠানের ভিতর থেকেই। নতুন করে শেখার অনীহা, নতুন অজানা কুশলতার সম্বন্ধে ভয়, পরিবর্তন বিরোধী মানসিকতা স্থিতাবস্থার দরুণ নিরাপত্তাবোধ এই সবই পরিবর্তনের অন্যতম বাধা। এই সব বাধা দূর করার জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয় তার মধ্যে আছে, কর্মীদের সংশয় দূর করা, নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া অংশীদার করা ধৈর্য, প্রশাসনিক পরিবর্তন ও সুদক্ষ নেতৃত্ব।

আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিকাশের প্রধান অন্তরায়। নানা প্রকার দ্বন্দ্ব প্রতিষ্ঠানে দেখা যায়, যেমন, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দ্বন্দ্ব, ব্যক্তি ও দলে দ্বন্দ্ব, একদলের সঙ্গে অন্যদলের দ্বন্দ্ব। নানা কারণে এই ধরনের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হতে পারে। ব্যক্তিগত ঈর্ষা বা ব্যক্তিগত স্বার্থের সংঘাত, পদস্থ ব্যক্তির সিদ্ধান্তের দরুন তার, সঙ্গে কর্মীদের বিরোধ আবার কখনও একদলের স্বার্থের সঙ্গে অপর দলের স্বার্থের সংঘাত। দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য প্রয়োজন, লক্ষ্য সম্বন্ধে কর্মীদের পরিষ্কার ধারণা দেওয়া, নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা, উপযুক্ত যোগাযোগ এবং সমন্বয় সাধন।

প্রতিষ্ঠানের বিকাশের আবশ্যকীয় শর্ত হল মানবসম্পদের বিকাশ ও তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

১০.৭ প্রশ্নাবলী (Questions)

(১) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিকাশ বলতে কি বোঝায়? কি কি কারণে শিক্ষার পরিবর্তন আসতে পারে?

(২) পরিবর্তনে বাধা আসে কেন? কি করে এই বাধা দূর করা যায়?

(৩) অর্ন্তদ্বন্দ্ব কি? এই দ্বন্দ্ব কত রকমের হয়? কিভাবে এই দ্বন্দ্বের নিরসন সম্ভব?

(৪) মানবসম্পদ বিকাশের প্রক্রিয়ার স্তরগুলি আলোচনা করুন।

(৫) শিক্ষকতার উন্নতিকল্পে কি ভাবে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়?